ডেটলাইন-১৯৭১
করাচী থেকে ঢাকা

তৌফিক রহমান

তৌফিক রহমান আপাদমস্তক সংস্কৃতিমনস্ক একজন ব্যক্তিত্ব। কৈশোর থেকেই নানামুখি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবাধ বিচরণ। সেই সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাকালীন সময় থেকেই সাংগঠনিক আবৃত্তি ও নাট্যচর্চার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। প্রথমে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কথা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রে আবৃত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরবর্তীকালে আবৃত্তি সংগঠন 'ক'জনা' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এর সভাপতি। এছাড়াও সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার এবং পরবর্তী সময়ে 'দেশ নাটক'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত দেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান 'বাংলাদেশ ভ্রমণ'-এর মূল পরিকল্পক ও উপস্থাপকের দায়িত্বও পালন করছেন।

পেশাগতভাবে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পর্যটন প্রতিষ্ঠান 'জার্নি প্লাস'-এর প্রধান নির্বাহী। এছাড়াও ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (টোয়াব)-এর সাথেও জড়িয়ে আছেন দীর্ঘদিন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি 'হোটেল এণ্ড ট্যুরিজম' বিষয়ে সম্পন্ন করেছেন কয়েকটি সম্মানীয় ফেলোশীপ।
১৯৯৯ সালে বেলজিয়ামের Wes Institute থেকে Tourism Marketing Planning বিষয়ে, ২০০৩ সালে আমেরিকার হাওয়াইয়ে অবস্থিত University Of Hawaii থেকে এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট ফর ট্যুরিজম (EDIT) কোর্স এবং ২০০৪ সালে শ্রীলংকায় Mice Management কোর্স-এ কৃতিত্বের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল হোটেল এণ্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এণ্ড হসপিটালিটি ম্যানেজম্যান্ট বিভাগে অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মূলত পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ থেকেই পর্যটন বিষয়ে লেখালেখির শুরু। একটা সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক '*সচিত্র সন্ধানী*' পাক্ষিক '*অনন্যা*'য় নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। ভ্রমণ করেছেন আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, নেদারল্যাণ্ডস, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, জাপান, চীনসহ পৃথিবীর প্রায় ৩৭ টি দেশ।

আলোকচিত্রঃ তাসমিয়া রহমান অর্থী
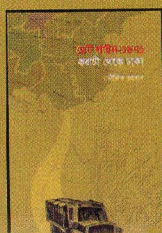
Dateline-'71
Karachi Theke Dhaka
by Taufiq Rahman
A Publication of
Magnum Opus
Dhaka Bangladesh
Published by
Anwar Faridee : February 2012
ডেটলাইন-১৯৭১ : করাচী থেকে ঢাকা
তৌফিক রহমান
প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৮ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক
আনোয়ার ফরিদী
ম্যাগনাম ওপাস
১১২ আজিজ সুপার মার্কেট বেজমেন্ট শাহবাগ
ঢাকা-১০০০ সেলফোন : ০১৯৩৭২৭৭৭৪৩
E-mail: magnumopusbds@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কিরীট রঞ্জন বিশ্বাস
কম্পোজ : নূরুন নাহার
ম্যাগনাম মিডিয়া
১১২ আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
শাহবাগ ঢাকা-১০০০।
মুদ্রণ : আল-আমিন কালার প্রিন্টিং
১৫৮/এ আরামবাগ ঢাকা-১০০০।
মূল্য : ১২০ টাকা
ISBN : 978-984-739-029-1
US : $ 7 UK : £ 5

উৎসর্গ

অকাল প্রয়াত বন্ধু-মুক্ত চিন্তার মানুষ
মুক্তিযোদ্ধা রবিউল হোসেন কচি
—যার অনুপ্রেরণায় এই লেখার শুরু ...

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিকতা এখনও আমাদের দৃষ্টিসীমায় পুরোপুরিভাবে উদ্ভাসিত নয়। গোটা জাতি একাট্টা হয়ে যে সংগাম পরিচালনা করেছে তার ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে অনেক প্রসারিত। লড়াইয়ের মাঠে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে হাজারো মানুষ, অকাতরে বিসর্জন দিয়েছে প্রাণ। অবরুদ্ধ শহরে-বন্দরে-গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাভিযানে ঝরে গেছে কত অযুত প্রাণ, তারপরও মৃত্যুর শঙ্কা মাথায় নিয়ে অধিকৃত অঞ্চলের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছে সার্বিক সহায়তার হাত। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন দ্বারা উচ্ছেদকৃত কোটি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো ভারতের শরণার্থী শিবিরে। এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের আশ্রয়, আহার, জীবনধারণের ব্যবস্থা করবার দুঃসাধ্য দাবি মেটাতে সার্বিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো সেদেশের সরকার ও সাধারণ মানুষ। এর পাশাপাশি পাকিস্তানে আটকে পড়েছিলো হাজারো বাঙালি ও তাঁদের পরিবার-পরিজন। পাক সামরিক শাসকেরা যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল গোটা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে সেই আক্রমণের স্বাভাবিক শিকার হয়েছিলো পাকিস্তানে কর্ম ও বসবাসরত অসংখ্য বাঙালি পরিবার। মুক্তিযুদ্ধকালে তাদের হতে হয় নানা বঞ্চনা ও অপমানের শিকার, আর বাঙালির বিজয়ের পর শুরু হয় তাদের লাঞ্ছিত করবার বিভিন্ন আয়োজন, সভ্য সমাজের সবরকম রীতিনীতি পদদলিত করে পাক সামরিক শাসকগোষ্ঠী বেসামরিক বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে। তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় বিপুলসংখ্যক পেশাজীবীকে, অনেককে তুলে নিয়ে বন্দি করা হয় আটকখানায়। পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের বড় অংশ শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসায় সামান্য চিড় ধরতে দেন নি, যে-যেভাবে পেরেছেন দেশের পক্ষে আপন অবস্থান দৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছেন। সেই চরম প্রতিকূল পরিবেশে নানাভাবে পালিয়ে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে পৌঁছেছেন আফগানিস্তানে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা পথ দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন কাবুলে, তারপরে ভারত হয়ে ফিরেছেন স্বাধীন স্বদেশভূমিতে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যখন শেষ হয়েছে তখন থেকে শুরু হয়েছে আটকে-পড়া বাঙালিদের মুক্তির আরেক সংগ্রাম।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের এই পর্ব নিয়ে খুব বেশি লেখা চোখে পড়ে না। পাকিস্তানে অবরুদ্ধ দিন, আটকখানায় বন্দিজীবন এবং সব রকম সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশের অভিজ্ঞতা বিষয়ে গুটিকয় বই প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রায় অনালোচিত সেই অধ্যায় নিয়ে তৌফিক রহমান প্রণীত *'ডেটলাইন ১৯৭১ : করাচি থেকে ঢাকা'* গ্রন্থ প্রকাশকে তাই নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাতে হয়। দেশপ্রেমের প্রশ্নে নিরাপোষ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনে নেমে-আসা বিপর্যয় এবং বিপদ-বাধা অতিক্রম করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষ্য গল্পকথার আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। ছোট দুই পুত্র-কন্যা ও দুগ্ধপোষ্য এক শিশু নিয়ে করাচিতে স্বামী-স্ত্রীর

সাজানো সংসার, আকস্মিক নেমে-আসা বিপদ মোকাবিলায় তাঁরা কীভাবে অগ্রসর হলেন তা বিধৃত হয়েছে পরিবারের সেই বালক সন্তানের দ্বারা, যার বিশেষ কোনো স্মৃতি থাকবার কথা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর বাবা-মায়ের কাছ থেকে স্মৃতিভাষ্য উদ্ধার করে তৃতীয় পুরুষের জবানিতে কাহিনী ব্যক্ত করেছেন লেখক। একাত্তরের অভিজ্ঞতা যে পরিবারের ভেতরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান রয়েছে, এই অভিজ্ঞতা যে ইন্টার-জেনারেশনাল, তার এক চমকপ্রদ উদাহরণ এই গ্রন্থ। সেই সাথে তা মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক বাস্তবতার অনন্য দলিল, আকারে কৃশ হলেও তাৎপর্যে বিশাল। ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার বয়ান কেবল নয়, একাত্তরের অভিজ্ঞতার বহমানতা ও পুনর্জন্মের পরিচয় বহন করছে এই বই। এমন স্মৃতিভাষ্য লিপিবদ্ধ করবার জন্য প্রীতিভাজন তৌফিক রহমানকে জানাই ধন্যবাদ।

মফিদুল হক
লেখক ও প্রবন্ধকার
সদস্য সচিব
ট্রাস্টি বোর্ড
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

লেখকের কথা

মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। গবেষণা এবং ইতিহাস রচনার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতিতেও মুক্তিযুদ্ধ উঠে এসেছে নানাভাবে। কিন্তু এখনও মুক্তিযুদ্ধের বেশ কিছু অজানা আর অচেনা ইতিহাস রয়েছে—যাঁর দেখা পাননি ইতিহাসবিদরা। সে রকমই একটি ঘটনা রশীদ সাহেবদের কর্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে জীবনের ঝুঁকি আর মৃত্যুকে বাজি ধরে করাচী থেকে কাবুল, দিল্লি আর কলকাতা হয়ে শরণার্থী হিসেবে দেশে ফিরে আসা। ১৭ দিনের এ অভি-যাত্রার বিপদসংকুল ঘটনাই মূলত বর্ণিত হয়েছে এই বইয়ে।
সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বহু সংখ্যক সামরিক—বেসামরিক বাঙালি কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই ফিরে আসার স্মৃতি কিংবা গল্প নিয়ে কোনো লেখালেখি আমার চোখে এখনও ধরা পড়েনি। প্রকাশক বন্ধু আনোয়ার ফরিদীও জানালেন যে, তাঁর চোখেও সে রকম লেখা ধরা পড়েনি। ফলে আমার উৎসাহ এক্ষেত্রে আরও বেড়ে গেলো। যদিও আমি মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ এবং সেই সময় নিতান্তই ছোট ছিলাম—তারপরেও কেন এ কাজে হাত দিলাম, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। বিনীতভাবে বলি, বইয়ে উল্লেখিত ওই রশীদ সাহেবই প্রকৃতপক্ষে আমার বাবা, আর আমি লেখায় বর্ণিত তাঁর বড় ছেলে অহন। যদিও আমার খুব বেশি স্মৃতি নেই, তবে দেশে ফিরে বাবা-মায়ের কাছে পুনরায় পুরো ঘটনা শুনে অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার। তা না হলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টিও হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। সুতরাং বিবেকের তাড়নায় এবং ইতিহাসের দায়বদ্ধতায় সর্বোপরি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরার একটা দায়িত্ব অনুভব করছিলাম।
তবে এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার বন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা রবিউল হোসেন কচির কথা—যিনি ২৯ মার্চ ২০০৯ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি আমার কাছ থেকে বিষয়টা শুনেই লেখার জন্য তাগিদ দেন। কচি ভাই বেঁচে থাকতেই তাই লেখাটা শুরু করেছিলাম। আজ—দুঃখ যে, কচি ভাই লেখাটার শেষ দেখে যেতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে ম্যাগনাম ওপাস-এর কর্ণধার আনোয়ার ফরিদীও যথেষ্ট তাড়া দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার বাবা-মার প্রতি—যারা ছিলেন ওই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। এছাড়াও আমার ভাই-বোনকেও কৃতজ্ঞতা—যারা ছিলেন আমার সহ পাত্র-পাত্রী। তৃতীয় প্রজন্মের উপলা, উপমা, অর্থী, অহন, ফাইয়াজ আর ইশাকেও অনেক ভালোবাসা আর আদর। এছাড়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা মফিদুল ভাইয়ের প্রতি-যিনি এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তাঁকে আমি আমার বাবার মতই শ্রদ্ধা করি। সর্বোপরি মুক্তিকামী দেশের সাধারণ জনগণ যারা জীবনকে বাজী রেখে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে আমাদের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড আর স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছেন—সেসব সাহসী মানুষকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও রক্তিম অভিবাদন।।

তৌফিক রহমান
ঢাকা

রাত আড়াইটা। গভীর নিস্তব্ধতা আর সুনসান এক নীরবতা চারদিকে। বাড়ির পেছনের সীমানা দেয়ালের বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে দুয়েকটা সারমেয়র চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে চারদিকে। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন বাড়ির কর্তা আবদূর রশীদ। খুব সন্তর্পণে পা ফেলে চলে এলেন বাড়ির বারান্দায়। পাছে কেউ সন্দেহ করে কিংবা ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাই বাতিও জ্বালালেন না তিনি। বারান্দার গ্রীল দিয়ে নিচে তাকালেন। নাহ্ রাস্তায় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কলোনির অন্যসব বাড়ির আলো নেভানো। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—স্বপ্নের জগতে ভ্রমণরত। তবে কি ওঁরা আজ আর আসবে না? কথা দিয়ে কথা রাখবে না? নাকি আমাদের পরিকল্পনার কথা সব ফাঁস করে সবাইকে ধরিয়ে দেবে ? স্ত্রী আর শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে তবে কি পালিয়ে বেড়াতে হবে ? এমন সব হাজারো প্রশ্ন মাথায় আসছে। বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। চাঁদের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে আলতো করে ঘরে এসে পড়ছে। সেই স্বল্প আলোয় তাকালেন ঘরের ভেতরে। ঘরের আসবাবপত্রগুলো সবই থরে থরে সাজানো। খাট, দোলনা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বইয়ের র‍্যাক, টেবিল-চেয়ার সব নজরে এলো তাঁর। রান্নাঘরে আড়াই মণ ওজনের একবস্তা চাল, ডাল, চিনি, তেল আর হাড়ি-পাতিলের স্তুপ।

এখন রমজান মাস বিধায় ছোট্ট হাড়িতে ইফতার তৈরির ছোলা ভেজানো। আজ ২১ অক্টোবর অর্থাৎ ১৩তম রোজা। গত ৮ অক্টোবর ছিলো প্রথম রোজা। রোজার শুরুতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন যে, 'যথেষ্ট হয়েছে। এদেশে আর না। এভাবে পালিয়ে আর কতোদিন থাকা যায়। মানসিক অশান্তি নিয়ে এখন বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাহ! যা আছে কপালে। এখান থেকে পালিয়ে ফিরে যেতে হবে আমার প্রিয়তম স্বদেশ বাংলাদেশে। তা যতো দ্রুত

সম্ভব ততোই ভালো।' এতো সব এলোমেলো চিন্তা ভীড় করছিলো তাঁর মাথায়।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো খাটের ওপর। স্ত্রীর পাশে সাত বছরের বড় মেয়ে উপলা, পাঁচ বছরের বড় ছেলে অহন এবং ছয় মাসের ছোট ছেলে ফাইয়াজ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মাথার উপরের ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটি বাতাস দেয়ার পাশাপাশি বিদঘুটে শব্দ করছে। চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে বিধায় ওই শব্দটি বড্ড কানে এসে বাজছে। মনে হচ্ছে, আশে-পাশের প্রতিবেশীরা ওই শব্দে এক্ষুনি বুঝি জেগে উঠবে। হাঁটতে হাঁটতে ড্রইং রুমের দিকে এগোলেন তিনি। সোফা, টেবিল, হেলানো বেতের চেয়ার, বইয়ের র‍্যাক সবই নজরে এলো তাঁর। হেলানো বেতের চেয়ারে আস্তে করে গিয়ে বসলেন তিনি। আলতো করে চোখ দুটো বুঁজে অতীত দিনগুলোতে ফিরে গেলেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) কথা স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো তাঁর। সেটা ১৯৫৭ সাল—যে বছর তিনি ওই কলেজ থেকে বি.কম পাশ করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে রেজাল্ট বেরিয়েছিলো। ৭ ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের হাল ধরার তাগিদ অনুভব করছিলেন। তাই চাকরির সন্ধানে নেমে পড়লেন তিনি। একদিন তখনকার বিখ্যাত আজাদ পত্রিকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের একটা বিজ্ঞাপন নজরে এলো তাঁর। কিছু কর্মী নেয়া হবে ওখানে। তৎক্ষণাৎ একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

যথারীতি ইন্টারভিউ কার্ড এলো অক্টোবরে। মনে আছে, সদরঘাটে অবস্থিত স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের অফিসে একই দিনে লিখিত এবং পরে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তারপর আবার অপেক্ষা। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চলে এলো। ইতিমধ্যে অফিস থেকে পাকিস্তান যাবার অগ্রীম বিমান ভাড়া দেয়া হলো। যেহেতু তাঁর পোস্টিং হয়েছে করাচীতে, তাই ওই টাকা দেয়া হয়েছে তাঁকে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দূর দেশে একা একা থাকতে হবে। সবাই বিষয়টিকে সহজভাবে নিলেও মায়ের মন তো মানে না। রশীদ সাহেবের মা কিছুতেই তাঁর এ যাত্রা মানতে পারছিলেন না। বারবার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছিলো তাঁর চোখ। পরবর্তী সময়ে অনেক বুঝিয়ে মাকে শান্ত করা গেলো।

ইতিমধ্যে ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ চলে এলো। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ) এর রাতের ফ্লাইটে রওনা দিলেন তিনি করাচীর উদ্দেশ্যে। সেই তাঁর প্রথম বিমান ভ্রমণ।

পরদিন সকালে করাচী বিমানবন্দরে পৌঁছে করাচীতে অবস্থানরত এক পুরনো বন্ধুর সহায়তায় মেসের জীবন শুরু হলো। এলাকার নাম ফেডারেল ক্যাপিটাল এরিয়া বা সংক্ষেপে এফসি এরিয়া। যথারীতি করাচীর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর হেড অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হলো। এরপর শুরু হলো তাঁর এক নতুন জীবন। পরিবার-পরিজন ছেড়ে একা একা থাকা। নিজেরা রান্না-বান্না করে খাওয়া। আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গল্প-গুজব করে সময় কাটানো। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর বের হতেন করাচীর রাস্তায়। কখনো একা কখনো বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হেঁটে বেড়াতেন আলো ঝলমলে নগরীতে। মাঝে মাঝে আশে-পাশের দর্শনীয় স্থানগুলোতে বেড়াতে বের হওয়া— এভাবেই কাটছিলো তাঁর করাচীর একাকী জীবন।

আর এভাবেই প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলো। অফিস আর করাচীর জীবনের সাথে ক্রমশ খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন রশীদ সাহেব। এখানকার সব কিছুই ভালো লাগে তাঁর, শুধু মাঝে মাঝে একাকিত্ব গ্রাস করে তাঁকে। আত্নীয়-স্বজন কিংবা পরিবারের কেউই নেই পাশে—যাদের সাথে দু'দণ্ড কথা বলা যায়। আর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে স্নেহময়ী মায়ের কথা। সাত ভাইয়ের সংসারে কেন জানি মা বোধ হয় একটু বেশিই স্নেহ করতেন তাঁকে। আর রশীদ সাহেবও কেন জানি তা বেশ বুঝতে পারতেন। আর তাই আড়াই বছর পর ১৯৬০ সালের জুন মাসে প্রায় দু'মাসের ছুটি নিয়ে করাচী থেকে প্রথম দেশে ফিরলেন তিনি। এয়ারপোর্টে নেমে সে কি আনন্দ তাঁর। বারবার মনে হচ্ছিলো, কতো যুগ পরে যেন দেশে ফেরা। স্বদেশ আমার স্বদেশ।

প্রায় দু'মাস ছুটি শেষে আবার ফিরলেন কর্মস্থল করাচীতে। আবার সেই একঘেয়ে জীবন। অফিস, মেস, রান্না-বান্না, একটু ঘোরাঘুরি এভাবেই কাটছিলো জীবন। ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। রশীদ সাহেবও একাকীত্বের অবসান ঘটাতে চাইলেন। একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন—যে তাঁর একাকীত্বের অবসান

ঘটিয়ে ছড়িয়ে দেবে আনন্দের বন্যা। সংসার আর অনাগত সন্তানের ভাবনায় আন্দোলিত হলো তাঁর মন-প্রাণ। আর তাই দেড় বছর পর আবার দেশে ফেরা। সেটা ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। পরিবার থেকেও তাঁর বিয়ের কথা ভাবা হচ্ছিলো। সুতরাং আর দেরি কেন। তাই বেশ ঘটা করেই ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সপ্তাহে তিনি বিয়ে করলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বেগম শামসুন্নাহারকে। অবশেষে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন পশ্চিম পাকিস্তানের নিজ কর্মস্থলে। প্রথমে এক বন্ধুর বাসায় কিছুদিন কাটিয়ে ভাড়া করা এক বাসায় গিয়ে উঠলেন। কয়েক মাস এভাবেই কেটে গেলো। নব বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি প্রায় প্রতিদিনই ঘুরে-বেড়াতে লাগলেন হকস্ বে সমুদ্র সৈকত, ক্লিপটন সমুদ্র সৈকত, গান্ধী গার্ডেন কিংবা করাচী চিড়িয়াখানায়। বেশ আনন্দেই কাটছিলো তাঁদের জীবন। অতঃপর প্রায় দু'বছর পর ১৯৬৫ সালের ১০ মার্চ তাঁদের কোল জুড়ে এলো প্রথম কন্যা সন্তান উপলা। রশীদ দম্পতির আনন্দ আর ধরে না। করাচী হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে জন্ম নেয়া উপলা যেন সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে এলো তাঁদের জীবনে। একঘেয়ে আর একাকীত্বের জীবনে উপলা যেন আলোর ঝর্ণাধারা।

এতোদিন ভাড়া বাসায় থাকতেন রশীদ দম্পতি। অতঃপর ১৯৬৭ সালে করাচীর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের স্টাফ কোয়ার্টার বরাদ্দ পেলেন তিনি। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে উঠে গেলেন কোয়ার্টারে। জায়গাটির নাম নর্থ নাজিমাবাদ। বেশ বড়-সড় কোয়ার্টার এলাকা। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নানান শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বাসস্থান এটি। এরই মধ্যে আবারও আনন্দের খবর এলো। রশীদ সাহেব আবারও পিতা হচ্ছেন। ১৯৬৭ সালের ২১ মে দ্বিতীয় বারের মতো কোল জুড়ে এলো পুত্র সন্তান অহন। এরই মধ্যে রশীদ সাহেবের ছোট দু'ভাই পূর্ব পাকিস্তানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে তাঁর কাছে চলে এসেছেন উচ্চতর পড়াশোনার জন্য। এমনিতেই দু' সন্তান নিয়ে হিমসিম খাবার জোগাড় রশীদ সাহেবের। কিন্তু কি আর করা। আপন ভাই বলে কথা। তাই স্ত্রী-সন্তান আর ভাইদের নিয়ে নবযাত্রায় শুরু হলো তাঁর আরেক সংগ্রাম। একে তো সংসার বড় হয়েছে, তার ওপর গ্রামের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আর্থিক সহযোগীতা করতে হয়। রশীদ সাহেবের একেবারে

বেসামাল অবস্থা। দু'ভাই ইতিমধ্যে বি.এ পাশ করে ফেলেছেন। এরই মধ্যে এক ভাই দেশে ফিরে গেলেন। অন্যজন এম.এ-তে ভর্তি হলেন। রশীদ সাহেব ভাবলেন—যেহেতু তিনি নিজেও বি.এ পাশ করে চলে এসেছেন, সেহেতু এম.এ-টা করা হয়নি তখন। এখন যেহেতু ছোট ভাই এম.এ করছে তাই ওঁর কাছ থেকে নোট নিয়ে এম.এ-টা করে ফেললে কেমন হয়। যেই কথা সেই কাজ। দিনের বেলায় অফিস আর রাতের বেলায় ভাইয়ের কাছ থেকে নোট নিয়ে পড়াশোনা। বেশ ভালোই সময় কাটছিলো রশীদ সাহেবের। সংসার, অফিস সামলে দু'বছরের মাথায় বাংলা সাহিত্যে এম.এ-টা শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের সাথে করেই ফেললেন রশীদ সাহেব।

ইতিমধ্যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তা অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণও বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে বসেই সেই উত্তাপ টের পেলেন রশীদ সাহেব।

৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের সময় রশীদ সাহেব লাখো মানুষের মিছিলে মনে হলো উপস্থিত। উত্তেজনায় সবার সারা শরীর কাঁপছিলো। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্যাবর জেট আর হেলিকপ্টারগুলো উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। একটি জাগ্রত জাতিকে ওরা ভয় দেখাতে চায়! কিন্তু লক্ষ মানুষের জয় বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে স্যাবর জেট ও সামরিক হেলিকপ্টারের গর্জন তলিয়ে গেলো। পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ শুরু হলো।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন—"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন এবং বোঝেন, আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খাঁ মার্শাল

ল' জারি করে দশ বছর আমাদেরকে গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। এরপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।'

রশীদ সাহেবের কল্পনায় ভেসে উঠলো বঙ্গবন্ধুর চেহারা। কী দীর্ঘ ও সুদর্শন মানুষ। লাখো জনতা ফুঁসে উঠছে তাঁর ভাষণের প্রতিটি পর্যায়ে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। নেতা যা বলে যাচ্ছেন তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের সাথে একাত্ম হয়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো মানুষ ফুঁসে উঠছে। ঘটনাপ্রবাহের সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দিয়ে নেতা এবার তার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করলেন। 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে। সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতর, ওয়াপদা কোনো কিছুই চলবে না। ২৮ তারিখ গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো—প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা কিছু আছে, সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। মনে রাখবা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শুনে, কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে কর্মচারিরা টেলিভিশনে যাবে না। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

এরপর আসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক— 'এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে। বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ

গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।'

৭ মার্চের বিকেল থেকেই শুরু হয়ে গেলো ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দিয়েছেন বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা। পূর্ব পাকিস্তান কার্যত চলছে তারই নির্দেশে। অফিস-আদালত, মিল-কারখানা, ব্যাংকবীমা সবই তার আদেশ মেনে নিয়েছে। মিলিটারির লরিগুলো আগের মতো ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা শহরে বেরুতে ভয় পাচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, রাজশাহীর সড়কগুলোতে গাছ, লাইট পোস্ট আর ইটপাটকেল ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। এ যেন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার এক নজিরবিহীন প্রতিরোধ। এরই মধ্যে চলে এলো সেই কালো রাত–২৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী অতর্কিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কেঁপে উঠলো পুরো দেশ। শুরু হলো পাকিস্তান মিলিটারির বর্বর অভিযান 'অপারেশন সার্চলাইট'। হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ওরা প্রথমে ঢাকায়, তারপর দখল নিতে শুরু করে শহর, বন্দর, গঞ্জ ও গ্রাম। ওদের চোখে ইসলাম আর পাকিস্তানের একমাত্র শত্রু বাঙালি, অর্থাৎ যারা বাংলায় কথা বলে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করে। সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে বাঙালি মাত্রই 'হিন্দুস্থানের চর'–'ইসলামের দুশমন'। কাজেই ওদের খতম করো।

এদিকে খবর ছড়িয়েছে শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ রাতে সৈন্যরা বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। সবাইকে নিরাপদে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন নেতা কিন্তু নিজে পালাননি। ১২০০ মাইল দূরে বসে রশীদ সাহেবরাও ব্যথিত হলেন পশ্চিমা শাসকদের এই বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ দেখে। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারাও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। রশীদ সাহেব প্রতিদিন রাতে লেপের নীচে রেডিও নিয়ে শুয়ে শুয়ে বিবিসির বাংলাবিভাগের খবর শুনতেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর অজানা থাকলো না।

৭ মার্চের পুরো ভাষণ শুনে রশীদ সাহেবের মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। এবার পশ্চিমা কুকুরদের একটা উচিত শিক্ষা দেবে নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধারা। এরই মাঝে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো। এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো রশীদ সাহেবের মন। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এখানে কেমন করে থাকবেন। ইতিমধ্যে অফিসের পরিবেশও পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। এতোদিন আশেপাশে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে তাঁর কি দহরম মহরমই না ছিলো। প্রায় প্রতি সপ্তাহে একজন অন্যজনের বাসায় আসা,পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন বিকালে একসঙ্গে খেলাধুলা করা ইত্যাদি আরও কতো কি। হঠাৎই যেন সেই সম্পর্কে ছেদ পড়লো। পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু-বান্ধব এবং অফিসের কলিগরা পর্যন্ত তাঁদের অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেখলেই মুখ গম্ভীর করে পাশ কাটিয়ে চলে যান। মাঝে মধ্যে সহকর্মীরা ঠাট্টা আর রসিকতা করে। বলে, 'কেয়া মুজিবকা চামচা। টিক্কা খান, ডান্ডা মারকে ঠান্ডা কার দেগা।' এই ব্যাঙ্গোক্তির সাথে সাথে চলে অট্টহাসি। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের কর্মচারীরা ভয়ে মাথা নীচু করে চলে যায়। রাস্তা-ঘাট এমনকি হাট-বাজারে গেলেও চলে এমন অবস্থা। কি করে জানি, পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের বেশভুষা আর চাল-চলন দেখে সহজেই বুঝে যায় যে, আমরা বাঙালি। মনে আছে, একদিন অফিস শেষে বাজার করে ফিরছিলেন রশীদ সাহেব। পেছন থেকে শুনলেন কে যেনো তাঁকে লক্ষ্য করে বলছে, 'এ্যাই বাঙালি, কাহা যারাহে।' রশীদ সাহেব ভয়ে আর পেছনে তাকালেন না। দ্রুত হাঁটার মাত্রা বাড়িয়ে বাড়ি এলেন তিনি। এরপর থেকে বাইরে বের হলেই এক অজানা আশংকায় থাকেন তিনি। এই বুঝি তাঁদের ওপর চড়াও হয় পশ্চিমারা। ভয়ে ভয়ে অফিস করতে থাকেন তিনি। ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থানরত বিহারীরা উল্টোপাল্টা মন্তব্য করায় দেশব্যাপী উত্তেজনার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এর রেশ পড়ে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানেও। রশীদ সাহেব হঠাৎই পাড়া-প্রতিবেশীদের অদ্ভূত আচরণ লক্ষ্য করেন। এতো বছর পাশাপাশি বাসায় থাকার পরেও হঠাৎই তাঁরা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। রাস্তায় দেখা হলে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এ এক অস্বস্তিতে থাকা।

এর মাঝেই খবর পেলেন বাঙালিরা পাকিস্তানীদের নিমর্ম অত্যাচারে দেশ ছেড়ে শরণার্থী হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট ছোট ঘরবাড়ি গাছপালা সমৃদ্ধ রাজ্য ত্রিপুরা। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য শহর। মহারাজা কৃষ্ণকুমার মাণিক্য পুরাতন হাবেলি থেকে নতুন হাবেলিতে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন ১৮২৯ থেকে ১৮৪৯ এর মধ্যে। আগরতলার নতুন রাজবাড়িতে প্রথম ওঠেন মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। ১৮৫০ সালে এই বাড়িতেই জন্ম নেন যুবরাজ নবদ্বীপ কিশোর। নানা সংকটে রাজসিংহাসন স্থানান্তরিত করতে হয় তাকে কুমিল্লা শহরের দক্ষিণপ্রান্তের চরখায়। কুমিল্লার অস্থায়ী রাজবাড়িতেই নবদ্বীপ বাহাদুরের কনিষ্ঠপুত্র জন্মালেন। নাম শচীন দেববর্মণ। তারিখ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর। রাজপুত্র শচীন বাঙালি না হয়েও হয়ে উঠলেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী। বাঙালির আত্মার কণ্ঠ।

আগরতলার উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদের এখন তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই। কিন্তু অমোচনীয় স্মৃতিচিহ্ন আছে। যে নীরমহলে একদিন মহারাজা মহারানী বাস করতেন তা আজ পড়শি বাংলাদেশের মসানুষের আশ্রয় ঘর। মহারাজদের পরামর্শদাতা পন্ডিত হিসেবে কয়েক শতাব্দী আগে বাঙালি ঘর বেধেছিলো প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যে। ১৯৪৭-এর বুকে দাহন নিয়ে আসে ব্যাপকসংখ্যক বাংলাভাষী কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা থেকে। কিন্তু ১৯৭১ এর মার্চ থেকে ত্রিপুরার চেহারা আমূল পাল্টে যেতে থাকে। ছিন্নমূল মানুষের ভিড় বেড়ে চলে। এ ভিড় ঠেকানো অসম্ভব!

সম্ভবত সে কারণেই ত্রিপুরা হয়ে ওঠে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঘোষিত সমর রাজধানী। ঢাকায় ২৫ মার্চের বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু হবার পর থেকে প্রতিদিন প্রাণভয়ে, দৌড়ে, হেঁটে, ছুটে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরার মাটিতে প্রবেশ করতে থাকে মানুষ।

ত্রিপুরা শহরের প্রতিটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে শরণার্থী। প্রথমদিকে স্কুল, কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দেশত্যাগীদের জায়গা দেয়া হয়েছে। বাকিরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা গাছতলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পরিস্থিতি দেখে ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থান সুদৃঢ় করেছে পাকিস্তান সেনাবাহি-

নী। পলাতক নারী-পুরুষকে তারা পথে-ঘাটে বুলেটে-বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছে। শত শত যুবতীকে ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। এরপরও উদ্বাস্তু স্রোত ঠেকানো যাচ্ছে না। স্কুল-কলেজগুলোতে ক্লাস বন্ধ হয়েছে। হাসপাতালগুলো আহত মানুষে ভরে উঠেছে। ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষ শরণার্থীদের পক্ষে মাঠে নেমেছে।

ত্রিপুরার রাস্তার পাশে একটি পথসভায় বক্তৃতা চলছে, 'ত্রিপুরার ভাইবোনেরা, আমাদের পাশের বাড়িতে আজ চলছে মানব ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যা। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের একই ভাষাভাষীর উপর নির্বিচারে গণহত্যা নারী নির্যাতন ও গণ-অগ্নিসংযোগ করে চলছে। আর এসব করছে ওরা ধর্মের নামে! লক্ষ লক্ষ ভাইবোন ও শিশু-বৃদ্ধ জীবন বাঁচাতে ইতোমধ্যে আমাদের এ ক্ষুদ্র রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিনই ওরা আসছে বাণের পানির মতো। আমাদের যৎসামান্য সামর্থে আমরা ওদের আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশের নয়, এ যুদ্ধ প্রতিটি মানবতাবাদী মানুষের। এ যুদ্ধ আমাদের সকলের। আজ এই জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে চাই, ভারত সরকার যেন আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অনুমতি প্রদান করেন। আগামীকাল থেকে আমরাও মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার ধরতে চাই। ত্রিপুরার ভাই ও বোনেরা, আজ লজ্জা হচ্ছে। কারণ, মনীষী অদ্রে মালরো এসে যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র ধরার ঘোষণা দিতে পারেন, সেখানে আগরতলা থেকে আমরা পারব না কেন?'

সম্বিৎ ফিরে পেলেন রশীদ সাহেব। দেশ নিয়ে কতো ভাবনা তাঁর। দেশের জন্য কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে বসে থেকে কি বা করবেন তিনি। আর এভাবেই রশীদ সাহেবের ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন পুরো সময় স্ত্রী আর পুত্র-কন্যা নিয়ে কেটে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। অনেকবারই ভেবেছিলেন দেশে চলে আসার। কিন্তু কিভাবে আসবেন, যোগাযোগ তো বন্ধ। এরই মাঝে বছরের মাঝামাঝি সময়ে রশীদ সাহেবের স্ত্রী আবারও সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়েন। সুতরাং অনাগত সন্তান জন্ম নেয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর অন্য কোথাও যাবার উপায়ও ছিলো না। সুতরাং অফিস

শেষে সোজা বাসায় এসে লুকিয়ে রেডিওতে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান শোনা এবং মনে মনে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা—এই চলছিলো নিত্যদিন। মনে আছে তাঁর, যুদ্ধকালীন সময়ে সন্ধ্যার পর সারা শহরে কারফিউ জারী ছিলো। আকাশে যুদ্ধবিমান আর বোমা বর্ষণের উজ্জ্বল আলোয় ভরে যেত করাচীর আকাশ। ফলে গোলা বর্ষণের আশংকায় উপরের তলা ছেড়ে ফ্ল্যাটের সবাই জড়ো হতেন একতলার সিড়ি ঘরে। প্রধান দরজা বন্ধ করে কানে হাত দিয়ে কাটাতে হতো প্রায় প্রতি রাত। এভাবেই প্রতিদিন বিভীষিকাময় দিনগুলো কাটিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র জনযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তিরিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি আর তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার স্বাদ ১২০০ মাইল দূরে রশীদ সাহেবকেও স্পর্শ করে। তিনি পরিবার নিয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হন। মনে আছে, সেদিন আল্লাহর দরবারে দোয়া করে শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। কিন্তু সমস্যা হলো, এই আনন্দ পাড়া-প্রতিবেশি কাউকে জানানো যাচ্ছে না। এমনকি মুখে হাসি-খুশির রেশ নিয়ে বাইরে বের হওয়াও অনিরাপদ ছিলো সেই সময়। মনে মনে যতোই খুশি হন না কেন, তা প্রকাশ করা যাবে না—এভাবে কি আর কাটানো যায়। ইতিমধ্যে অফিসের পাকিস্তানি কলিগরাও খারাপ ব্যবহার করা শুরু করলো। দুয়েকজন কলিগতো বলেই ফেললো, 'You are no more our brother, from now on you are our Slave.' লজ্জায় আর ক্ষোভে-দুঃখে লাল হয়ে গেলেন রশীদ সাহেব। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারলেন, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু তিনি রশীদ সাহেবকে ঘাটালেন না। এমনিতেই তাঁর ওপর দিয়ে কি ধকলই না যাচ্ছে। যুদ্ধ শুরুর আগেই দু'ভাই দেশে ফিরে যাওয়ায় একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলার লোকও খুঁজে পেলেন না তিনি।

তখন ব্যাংক কোয়ার্টারে প্রায় ৩০০-৪০০ বাঙালি, পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসছিলো। রশীদ সাহেব হঠাৎই খেয়াল করলেন প্রায় প্রতিদিনই কিছু কিছু বাঙালিকে Concentration Camp-এ ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোকেরা। হঠাৎই তীব্র ভয় আর অজানা

আশংকায় দুলে উঠলো রশীদ সাহেবের মন। নিজেকে নিয়ে খুব বেশি ভাবেন না তিনি। কিন্তু স্ত্রী আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়েই তাঁর যতো চিন্তা। এদিকে আরেক সমস্যা হলো দেশের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিলো না। বিমান চলাচল তো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চিঠিপত্র দিয়েও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। কারণ, বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের তখন কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ ছিলো। রশীদ সাহেবের ছোট ভাই যিনি পাকিস্তানে থেকে লেখাপড়া করেছেন, তাঁর বন্ধু ছিলেন জনাব মজিদ খান (যিনি পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হয়েছিলেন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর স্ত্রী-সহ আমেরিকায় চলে যান উচ্চতর লেখাপড়ার জন্যে। রশীদ সাহেবকে মাঝে-মধ্যে চিঠি দিতেন তিনি। তাই দেশের সাথে যোগাযোগের জন্য পাকিস্তানে বসে রশীদ সাহেব চিঠি পাঠাতেন সুদূর আমেরিকায় মজিদ খানের কাছে। মজিদ খান আমেরিকা থেকে পরে তা পাঠিয়ে দিতেন বাংলাদেশে। আর এভাবেই দেশের আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবর পেতেন রশীদ সাহেব। প্রায় দেড় থেকে দু'মাস পরে চিঠিপত্র হাতে পেতেন তিনি। কিন্তু এতে কি আর মন ভরে।

এরই মাঝে একদিন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা ডেকে পাঠালেন তাঁকে। অজানা এক আশংকায় দুরু দুরু বক্ষে তাঁর কাছে গেলেন তিনি। ভদ্রলোক কেতাদূরস্ত মানুষ কিন্তু একেবারে এক খাঁটি পাকিস্তানি। খুবই শান্ত কিন্তু গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন, 'Are you interested to go back to so called East Pakistan or Want to stay back in Pakistan.' রশীদ সাহেব নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে বল্‌লেন, 'Since we are from East Pakistan or newly Bangladesh, So definitely we want to go back to our own country.' কর্মকর্তা বল্‌লেন, 'You are dismissed.' ব্যাস, এতোদিনের সম্বল চাকরিটা চলে গেলো রশীদ সাহেবের। শুধু রশীদ সাহেবই নন, তাঁর মতো আরও অনেক বাঙালিই তখন চাকরি হারিয়ে দিশেহারা। সকলেই তখন পথ খুঁজছেন কি করে দেশে ফিরে আসা যায়। কিন্তু কেউ কাউকে কিছুই বলছেন না। পাছে পাকিস্তানীরা তা জেনে যায়। জমানো টাকা-পয়সা দিয়ে সংসার চলছিলো তাঁর। হঠাৎই আবিষ্কার করলেন প্রায় প্রতিদিনই দুয়েকটা বাঙালি পরিবারকে

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি ব্যাপার Concentration Camp- এ ধরে নিয়ে যাচ্ছে না তো। পরে জানলেন যে, তাঁরা দালালদের মাধ্যমে আফগানিস্তান-ভারত হয়ে দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসা করেও এ সংক্রান্ত কোনো তথ্যই বের করতে পারলেন না তিনি।

এরই মাঝে ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল জন্ম নিলো রশীদ সাহেবের কনিষ্ঠ সন্তান ফাইয়াজ। এতো কষ্টের মধ্যেও আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো তাঁর ছোট্ট সংসারে। কিন্তু তারপর মাত্র ১৪ দিনের মাথায় এলো সেই খবর—যা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। ছোট ছেলের জন্মের ১৪ দিন পরে ১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল মারা গেলেন রশীদ সাহেবের প্রিয়তম মা, যিনি তাঁকে আদর করতেন সবচাইতে বেশি। কি হতভাগ্য তিনি, মায়ের মৃত মুখও দেখে যেতে পারলেন না। এমনকি মায়ের জানাজা-কবর কিছুতেই উপস্থিত হতে পারলেন না তিনি। একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন রশীদ সাহেব। বারবার তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিলো। ছোটবেলায় মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা, আদর করে খাওয়ানো, স্কুলে পাঠানো সব স্মৃতি ভেসে বেড়াতে থাকলো মনের কোণে। মনে আছে, ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো থাকায় বাবা-মায়ের আদর-ভালোবাসা একটু বেশিই জুটতো তাঁর কপালে। অন্যান্য ভাইরা এতে যে একটু-আধটু হিংসা করতো না তা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই সব হিংসা, আনন্দ-ভালোবাসায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতো। সেই স্নেহময়ী মা আজ আর নেই। ভাবতেই কষ্টে বুকটা ভারী হয়ে উঠলো রশীদ সাহেবের। হাজার মাইল দূরের এক দেশে বসে অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনায় বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে উঠলেন। নাহ, তাঁর এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। ছোট ছোট সন্তানদের কথা মনে করে মায়ের মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু বাঙালি এবং পাঠান দালালের খবর পাওয়া গেলো—যারা বাঙালিদের অর্থের বিনিময়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। রশীদ সাহেব তাঁদের খোঁজে নেমে পড়লেন। যে করেই হোক তাঁদের খুঁজে বের করতেই হবে। ফিরে যেতে হবে প্রিয়তম স্বদেশে। হঠাৎই কথায় কথায় কলোনির এক বাঙালি কলিগের ভাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেলো—যাঁর সাথে

কোনো এক পাকিস্তানি দালালের যোগাযোগ ছিলো। পরে জানা গেলো, ওই ভদ্রলোকও দালালীর সাথে যুক্ত। প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে তিনি সবই স্বীকার করল। আর এভাবেই কেটে গেলো বেশ ক'টি মাস। ইতিমধ্যেই অক্টোবর মাস এসে গেলো। আর ক'দিন বাদেই পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন কলোনির ওই ভদ্রলোক এক পাঠান দালালকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। রশীদ সাহেবের পাঁচ সদস্যর পরিবার। অনেক দর কষাকষির পর পাঁচ জনের জন্য সাড়ে তিন হাজার পাকিস্তানি রুপী সাব্যাস্ত হলো। বিনিময়ে ওরা রশীদ সাহেবদের পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তানের কান্দাহারে পৌঁছে দেবেন। এমনিতে ওঁরা মালবাহী ট্রাকে করে বাঙালিদের পারাপার করতেন। কিন্তু রশীদ সাহেব শিশুপুত্রের কথা ভেবে মালবাহী ট্রাকে যেতে চাইলেন না। সেক্ষেত্রে পাঁচশত পাকিস্তানি রুপী অতিরিক্ত দিয়ে কারযোগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সীমান্তে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন তাঁরা। রশীদ সাহেবও সানন্দে রাজি হয়ে ওই অর্থের পুরোটাই অগ্রীম বাবদ দিয়ে দিলেন।

এরপর শুধুই অপেক্ষা আর দেশে ফেরার স্বপ্নে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে অবগাহন করা। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো এরপরের দিনগুলো। কিন্তু কিছুতেই সময় কাটতে চায় না রশীদ সাহেবের পরিবারের। একেকটি দিন একেক বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। স্ত্রীকে নিয়ে পরিকল্পনা করছেন দেশে ফিরে যাবার। দেশে পৌঁছে কোথায় কোথায় যাবেন, কার কার সাথে দেখা করবেন, কাকে কি কি উপহার দেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে তিনি বাসার সোফা সেট, সেলাই মেশিন, শোকেসসহ ছোট-খাট সব আসবাবপত্র আশেপাশের প্রতিবেশীদের কাছে কম দামে বিক্রি করে দিলেন। অপেক্ষা আর অপেক্ষা। অপেক্ষার প্রহরগুলো যেনো শেষ হতে চায় না। মনে হয় কতো দীর্ঘ একেকটি দিন, ঘণ্টা আর মিনিটগুলো। প্রিয়তম স্বদেশে ফিরে যাবার স্বপ্নে বিভোর হন রশীদ সাহেব। এভাবেই কেটে যায় বেশ কিছুদিন। ইতিমধ্যে রমজান মাস চলে আসে। রশীদ সাহেবের চিন্তা আরও বেড়ে যায়। কারণ, অফিস থেকে ইতিমধ্যে চাকরিচ্যুত। ঘরের জমানো টাকা-পয়সাও শেষ হয়ে আসছে। তার ওপরে দালালদের ইতিমধ্যে পুরো টাকাটাই অগ্রীম বাবদ দেয়া হয়ে গেছে। যদি টাকাটা নিয়ে ওরা ভেগে যায়। এমনি হাজারো চিন্তা তাঁর

মাথায়। যেহেতু রোজা রাখতে হবে তাই বাজার থেকে রমজানের অত্যাবশ্যকীয় চাল, ডাল, ছোলা, মুড়ি কিনে আনলেন তিনি। ঘর থেকে বেরুতে একদম মন চায় না তাঁর। রোজা রাখা আর নামাজ পরেই তাই দিনাতিপাত করা। এভাবেই চলছিলো দিনগুলো।

এরই মধ্যে চলে এলো সেই বিশেষ দিন অর্থাৎ ২১ অক্টোবর, ১৯৭২ সাল। উত্তেজনায় গতরাতে একেবারেই ঘুম হয়নি তাঁর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধুই ছটফট করছিলেন তিনি। রাত আড়াইটার মধ্যেই ওদের চলে আসার কথা। এখন বাজে পৌনে তিনটা। কিন্তু ওদের দেখা নেই। এরই মধ্যে রশীদ সাহেবের স্ত্রী জেগে উঠেছেন। আগের রাতেই সব কিছু গোছগাছ করে রেখেছিলেন তিনি। হাত-মুখ ধুয়ে তিনিও অপেক্ষার সওয়ার হলেন। এবার অপেক্ষা দু'জনের। তিনটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ব্যাংক কলোনির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সাদা রংয়ের একটি টয়োটা কার এসে দাঁড়ালো রশীদ সাহেবের ফ্ল্যাটের সামনে। গাড়ির হেডলাইট দু'টো নেভানো। রশীদ সাহেব ওপর থেকে দেখেই চিনতে পারলেন তাঁদের। গাড়িতে বসা দু'জনই বাঙালি। একজন তৎকালীন কৃষি ব্যাংকে চাকরিরত তাঁর এক বন্ধুর ছোট ভাই। অপরজন তাঁর বন্ধু। তাঁদের দু'জনের সাথেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে পাকিস্তানি দালালদের। যাহোক, ওদের দেখে উপর থেকে স্ত্রী আর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে নীচে নেমে এলেন তিনি। সাথে একটি সুটকেস আর বাচ্চার খাবারের একটি ব্যাগ। ছোট্ট শিশু সন্তানটি তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মনে আছে, ঘর থেকে বেরুনোর সময় আঁচলে বারবার চোখ মুছছিলেন তাঁর স্ত্রী। রশীদ সাহেবেরও চোখ ছল্‌ছল্‌ করছিলো তখন।

গাড়িতে উঠে বসলেন রশীদ পরিবার। পেছনের সিটে তারা সবাই আর সামনে ওঁরা দু'জন। গাড়ি ছুটে চল্‌লো হাইওয়ে ধরে কোয়েটার পথে। পথে দুয়েকটা গাড়ি নজরে এলেও সারা শহর মূলত তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু একটু ভয়ও লাগছে রশীদ সাহেবের। কোথায় যাচ্ছেন, কার সাথে যাচ্ছেন, তাঁরা কতোটা সৎ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পুরো কাজটা করে দেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে প্রায় ৩০ মাইল গাড়ি চলার পরে করাচী-কোয়েটা হাইওয়ের একপাশে গাড়ি এসে থামলো। বাইরে বিশালদেহী দু' পাঠানকে এবার দেখা গেলো। ওঁরা গাড়ির পাশে এসে গাড়ির দু' বাঙালির

সাথে কথাবার্তা জুড়ে দিলো। হাসি-তামাসা কোনো কিছুই বাদ থাকলো না। এদিকে রশীদ সাহেব তো ভয়ে অস্থির। তাঁকে অভয় দিলেন বাঙালি ড্রাইভার দু'জন। 'কি রশীদ সাহেব ভয় পাচ্ছেন নাকি। আরে ভয়ের কিছু নেই। ওরা দু'জন আমাদেরই লোক। আমরা দু'জন এখন নেমে পড়বো। ওঁরা দু'জন এখন গাড়ি চালিয়ে আপনাদের বাকি পথটুকু নিয়ে যাবে। আসুন ওঁদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই।' বলে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওই দুই বাঙালি। এদের একজনের নাম কাদের খান আর একজনের নাম ওয়াহাব খান। হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠলো রশীদ সাহেবের। পাশে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রীরও চোখ ভেজা। ঘটনাটা বোধহয় আঁচ করতে পারলেন পাঠান দুই ড্রাইভার। রশীদ সাহেবের কাছে এসে জানতে চাইলেন এর কারণ। রশীদ সাহেব এবারে অঝোরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'আমার নিজের বাবার নাম আব্দুল ওয়াহাব আর আমার স্ত্রীর বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুরের নাম এ.এম.এ. কাদের। চিন্তা করো দেশ থেকে এতো দূরে এই বৈরী পরিবেশে তোমাদের নামের সাথে তাঁদের নামের এই মিল দেখে আমাদের বারবার তাঁদের কথাই মনে পড়ছে। তাই এ কান্না'। এবারে বিস্মিত হলেন দু পাঠান ড্রাইভার। তাঁরাও কিছুটা আবেগে আপ্লুত এ কথা শুনে। একজন বলে উঠলেন, 'আমাদের দু'জনের বয়স বোধকরি তোমাদের বাবার মতোই। মনে করো আমরাই তোমাদের বাবা। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আগে আল্লাহ্। আমরা থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নেই।" থামলেন ওই ড্রাইভার। এক অদ্ভুত অনুভূতি আচ্ছন্ন করলো তাঁদের।

গাড়িতে উঠে বসলেন দু' পাঠান ড্রাইভার। ইতিমধ্যে বিদায় নিয়ে চলে গেছে দুই বাঙালি ড্রাইভার। গাড়ি চলা শুরু করলো আবার কোয়েটা অভিমুখে। কিন্তু বেশিক্ষণ চল্‌লো না গাড়ি। ইতিমধ্যে সেহেরীর সময় হয়ে যাওয়ায় হায়দ্রাবাদে সেহেরীর বিরতী দিতে হলো। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁর দিকে এগোলেন কাদের খান আর ওয়াহাব খান। যাবার আগে রশীদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে কিছু খেয়ে নিতে বললেন। রশীদ সাহেব পরিবার নিয়ে গাড়িতেই বসে রইলেন। ওদিকে বাচ্চারা তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। করাচী থেকে রওনা দেয়ার সময়েই রশীদ সাহেবের স্ত্রী সাথে করে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছোট ব্যাগ খুলে

খাবারগুলো বের করলেন। এরই মধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে বড় মেয়ে ও ছেলে। তাঁদেরকেও কিছু খাবার খেতে দিলেন তিনি। কোনো কিছু না বলে চুপচাপ চলতে থাকলো তাঁদের খাবারপর্ব। প্রায় আধা ঘণ্টা পর সেহেরী খাওয়া শেষে ফিরে এলেন দুই খান। মুখে সেই স্মিত হাসি। 'ডারনা মাত্। আগে আল্লাহ্, পিছে হামলোক।' কথাগুলো বলে থামলেন কাদের খান। এবার আবার গাড়ি চলা শুরু করলো প্রধান সড়ক ধরে।

সুনসান নীরবতা চারদিকে। মাঝে মাঝে দু'য়েকটি মালবাহী ট্রাক দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। এরই মধ্যে সকাল হয়ে এলো। কিন্তু গাড়ি চালিয়েই যাচ্ছেন খানদ্বয়। মাঝে মাঝে ড্রাইভিং সিট বদল করে একেকজন গাড়ি চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে রশীদ সাহেবের ছোট শিশু পুত্র ফাইয়াজ ঘুম থেকে জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে দিলো। ততোক্ষণে গাড়ি পৌঁছে গেছে সিবি শহরে। ছোট শিশুটির দুধ বানানোর জন্য গরম পানি দরকার। তাই রশীদ সাহেব ড্রাইভারদের একজনকে বললেন, কোনো একটা রেস্টুরেন্ট দেখে গাড়ি থামাতে। দুধ বানানোর জন্য গরম পানি নিতে হবে। অতএব সিবি শহরের মাঝখানে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট দেখে গাড়ি থামালেন তাঁরা। গাড়ি থেকে সাথে আনা ছোট একটা ফ্ল্যাক্স নিয়ে নামলেন রশীদ সাহেব। তাঁর সাথে সাথে এগিয়ে এলেন ওয়াহাব খান। রেস্টুরেন্ট মানে হাইওয়ের পাশে ছোট দু' তিনটি বেঞ্চি দিয়ে একটা টং-ঘর এর মতো। ট্রাক ভিড়িয়ে দু'য়েকজন ড্রাইভার জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে চায়ের কাপে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। গরম পানি ফ্ল্যাক্সে ঢেলে স্ত্রীর কাছে নিয়ে এলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী দুধ বানাতে লাগলেন আর এরই ফাঁকে ফজরের নামাজ পড়তে গাড়ির সামনে জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ড্রাইভার দু'জন। এরই মধ্যে দুধ খাওয়ানো শেষ করে সব কিছু গুছিয়ে রাখলেন রশীদ সাহেবের স্ত্রী। যথারীতি নামাজ শেষে গাড়িতে এসে বসলেন ড্রাইভার দু'জন। পেছন ঘুরে বাচ্চাদের একটু আদরও করে দিলেন। এবার আবার গাড়ি চলতে শুরু করলো।

গাড়ি চলছে তো চলছে, চলছে তো চলছে। এ পথ যেনো শেষ হবার নয়। কতো কথা মনে পড়ছে রশীদ সাহেবের। ছোটবেলায় মা'র সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা, স্কুল-কলেজের গন্ডি পেরিয়ে ঢাকায় ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হওয়া, ঢাকায় থাকার জায়গা ছিলো না বলে ইস্কাটনে খালু বাসায় জায়গীর থেকে
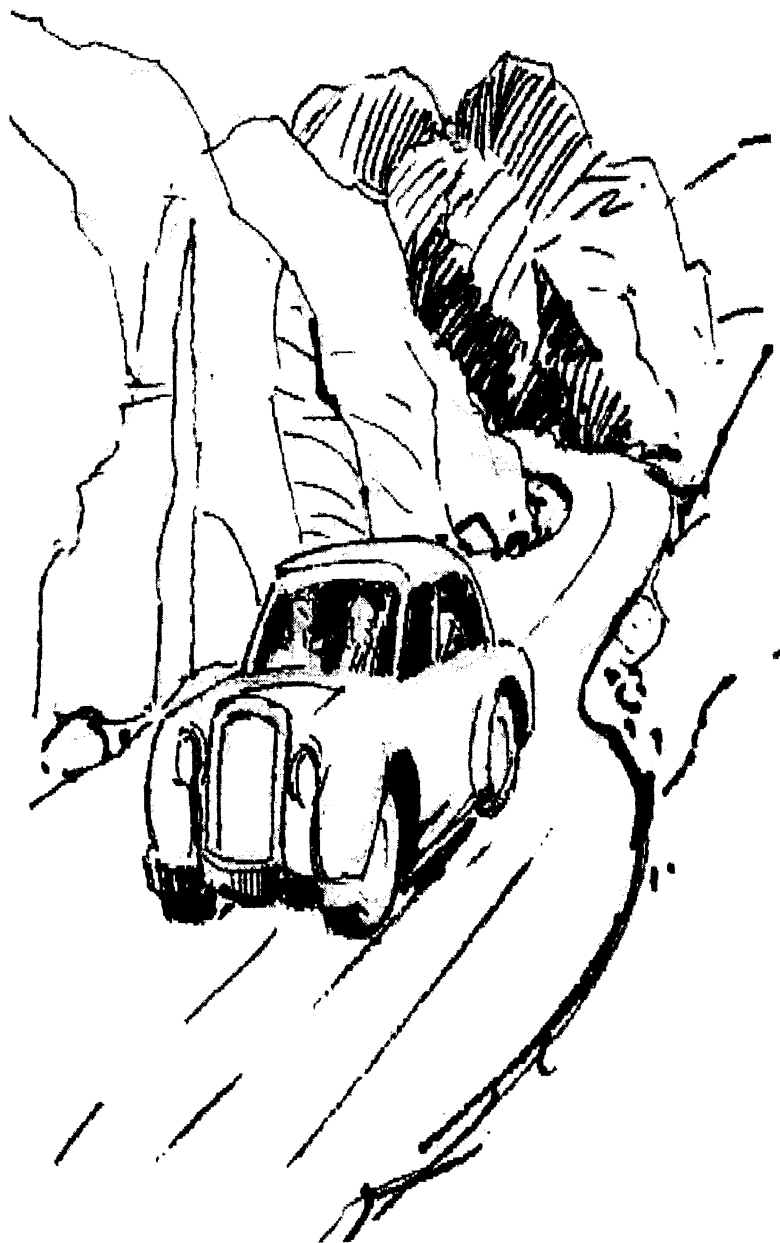
পড়াশোনা করা, ব্যাংকের চাকরিতে ইন্টারভিউ দেয়া, প্রথম বিমান চড়া এবং বিদেশ ভ্রমণ, করাচীর সেই একাকী দিনগুলো, অতঃপর বিয়ে সংসার সন্তান ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে আছে, ভৈরব হাজী আসমত কলেজ থেকে ১৯৫৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ভাবছিলেন কি করা যায়। গ্রামে তো আর উচ্চশিক্ষা নেয়ার সুযোগ নেই। ঢাকায় তাঁকে আসতেই হবে। কিন্তু ঢাকা শহরে কার বাসায় উঠবেন তিনি। তেমন আত্মীয়-স্বজন কই। এতোসব ভাবনা পেয়ে বসলো তাঁকে। বড় দু'ভাই মাধ্যমিক পাঠ চুকিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু উচ্চশিক্ষা তো তাঁকে নিতেই হবে। রশীদ সাহেবের এ ভাবনার অংশীদার হলেন তাঁর মা। তিনিও মনে প্রাণে চাইতেন, তাঁর ছেলে যেহেতু লেখাপড়ায় ভালো, তাই সে উচ্চশিক্ষা নিক। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ (যা বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে পরিচিত) অত্যন্ত নামি-দামি কলেজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো। সেখানেই পড়তে চান তিনি।

কিন্তু ঢাকায় থেকে বাসা ভাড়া করে পড়াশোনা চালানো খুবই কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ ছিলো সেই সময়। সুতরাং রশীদ সাহেব ঢাকায় কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কিনা তা খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎই মনে পড়ে গেলো তাঁর এক খালুর কথা যিনি ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে থাকতেন। মা-ই খুঁজে বের করলেন তাঁকে। এরপর ঢাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলো। কি কাকতালীয় ব্যাপার, তখন তিনিও তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য একজন গৃহশিক্ষক খুঁজছিলেন। ব্যস, সবকিছু মিলে গেলো। দু-একদিনের মধ্যেই রশীদ সাহেব রওনা দিলেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। সেই তাঁর প্রথম ঢাকায় আগমন। বড় বড় রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা, গাড়ি-ঘোড়া দেখে অবাকই হলেন গ্রামে বেড়ে ওঠা একজন রশীদ সাহেব। তৎকালীন ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে নেমে সোজা চলে এলেন ইস্কাটন গার্ডেনে খালুর বাসায়।

নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষজন। প্রথম প্রথম ঢাকার এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খুবই কষ্ট হতো তাঁর। ঢাকা শহর যে খুব বেশি ভালোও লাগতো তা নয়। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে থাকতে হলো তাঁর। সকালে কলেজে ক্লাস আর সন্ধ্যার পর খালাতো ভাই বোনকে পড়ানো। এরপর নিজের পড়ার প্রস্তুতি। এভাবেই কাটছিলো রশীদ সাহেবের সময়। রশীদ

সাহেবের খালুও তাঁকে বেশ উৎসাহ দিতেন পড়াশোনার ব্যাপারে। খালুর উৎসাহ আর নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৫৭ সালে খালুর বাড়িতে জায়গীর থেকে বি,কম পাশ করেন রশীদ সাহেব।

চলার পথে একেক সময় মনে হচ্ছিলো, কেন যে ব্যাংকের চাকরি নিয়ে এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে থাকা। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলো দেশে থেকে ছোট খাট চাকরি করা। আর কিছু না হোক পরিবার-পরিজন নিয়ে একসাথে তো থাকা যেতো। বর্তমান অনিশ্চয়তার জীবনের চেয়ে তা ঢের ভালো ছিলো। আর তাছাড়া পরিবারের এবং আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই তো মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছে। দেশে অবস্থান করলে নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া যেতো। দেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো লাগতো। যে অত্যাচার আর নিপীড়ন ওঁরা বাঙালিদের ওপর করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যেতো। করাচী অবস্থানকালে প্রায়ই তাঁর স্ত্রীর সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা হতো। তিনি বলতেন তাঁর মন খারাপের কথা। যুদ্ধে অংশ না নিতে পারা তাঁর জীবনের চরমতম কালো অধ্যায়। এই অনুশোচনা সারাজীবন তাঁকে কুরে কুরে খাবে। তখন সান্তনা দিতেন তাঁর স্ত্রী। বলতেন, "এই কি যুদ্ধ নয়। তুমি হয়তো সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধ করছো না, কিন্তু ইচ্ছে করলে কি তুমি অনায়াসে পাকিস্তানের পক্ষে তোমার মতামত দিতে পারতে না ? আর তাতে তোমার চাকরিটাও থাকতো এবং আমরাও এতো কঠিন সময় পার করতাম না। তোমার পরিচিত বেশ কয়েকজনতো পাকিস্তানের পক্ষে সায় দিয়ে এখানে থেকে গেছে। তুমি তো আর তাঁদের মতো গাদ্দার কিংবা বিশ্বাসঘাতক নও। শুধুমাত্র নিজ মাতৃভূমির টানে ছোট ছোট তিনটি শিশু সন্তান থাকা স্বত্ত্বেও ভালো একটি চাকরিকে পেছনে ফেলে এক অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছ। আদৌ আমরা সুস্থভাবে দেশে ফিরতে পারবো কিনা—তার নিশ্চয়তা কোথায়।'

স্ত্রীর কথায় একটু ধাতস্থ হলেন রশীদ সাহেব। সত্যিই তো। বাংলাদেশের বেশ ক'জনকেই তিনি চেনেন—যারা পাকিস্তানের পক্ষে সায় দিয়ে ওখানেই বহাল তবিয়তে থেকে গেছেন। তাঁর পক্ষেও খুবই সহজ ছিলো এ কাজ। ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তো তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেনই পাকিস্তানে থেকে যাবার। কিন্তু রশীদ সাহেব সেই সুযোগ নেননি। রশীদ

সাহেবের স্ত্রী আরও বলতে থাকলেন, 'যাঁরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করছে, তাঁরা তো জাতীয় বীর। কিন্তু তুমি, যে কিনা অবস্থানগত কারণে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারোনি, কিন্তু এই যে যুদ্ধ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে এই যে অনিশ্চিত জীবন–এটা কি সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে কম? সম্মুখ সমরের যোদ্ধারা যদি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্য সম্মান পায় তবে আমি তোমাকে বলছি, মন খারাপ করো না। তোমাদেরও সম্মানিত করবে নিশ্চয়ই বাঙালি জাতি। তোমরাও তো নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অজানা-অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়েছ, শুধুমাত্র দেশ মাতৃকার টানে। সুতরাং তোমরাও মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কম কিসে।" এতোটুকু বলে থামলেন রশীদ সাহেবের স্ত্রী। রশীদ সাহেবের চোখ এসময় চক্‌চক্ করে উঠলো। তাই তো ইচ্ছে করলেই তো অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখানে অনেকটা রাজার হালেই থাকা যেতো। এই কষ্টকর আর অন্ধকার জীবন কে চায়। কিন্তু হৃদয়ের ভেতর দেশের জন্য যে ভালোবাসা, তা কি করে মুছে ফেলা যাবে। মা, মাটি আর দেশের সঙ্গে প্রতারণা করে বাহ্যিক উন্নত জীবন-যাপন হয়তো সম্ভব কিন্তু তা হতো ক্ষণস্থায়ী। রাজাকার আর আল-বদর হওয়ার চেয়ে এই কষ্টকর জীবন অনেক ভালো। সম্বিৎ ফিরে পেলেন রশীদ সাহেব।

ওদিকে ড্রাইভার দু'জন তখনও পালাক্রমে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে এলো। দুপুরের খাবারের জন্য ড্রাইভার হাইওয়ে থেকে গাড়ি একটু নামিয়ে রাখলেন পার্শ্ববর্তী এক ভুট্টা ক্ষেতে। বিশাল ভুট্টা ক্ষেতের পাশে গাড়ি পার্ক করেই যোহরের নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন তারা। ওদিকে রশীদ সাহেবও তাঁর পরিবার নিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নেমে এলেন। এদিকে বড় ছেলে অহনের প্রকৃতির ডাক পেয়ে বসলো। এই ভুট্টা ক্ষেতের পাশে কংক্রীটের টয়লেট কোথায় পাবেন রশীদ সাহেব। অতএব প্রকৃতির ডাক প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে একাকার। হাইওয়ে থেকে যেখানে গাড়ি দাঁড়ানো তার পাশ দিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে পড়লেন রশীদ সাহেব। সঙ্গে পুরো পরিবার। ইচ্ছে করেই ভুট্টা ক্ষেতের আড়ালে রইলেন তাঁরা, পাছে হাইওয়ে থেকে কেউ দেখে ফেলে। সবাই বসে পড়লেন মাটিতে, ভুট্টা ক্ষেতে কাপড়-চোপড় নষ্ট হলো কিনা সেদিকে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সাথে থাকা পানির বোতল বের করে বাচ্চাদের একটু একটু

করে পানি পান করালেন। বাচ্চাদের ক্ষিধেও লেগেছে প্রচুর। করাচীর কলোনির বাসা থেকে বের হওয়ার সময়েই রশীদ সাহেবের স্ত্রী বুদ্ধি করে কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি রশীদ সাহেবকে বললেন, গাড়ির ভেতর থেকে খাবারের ব্যাগটা নিয়ে আসতে। রশীদ সাহেব উঠে পড়লেন। ভুট্টা ক্ষেত পেরিয়ে বাইরে গাড়ির কাছে আসতেই নাসিকা গর্জনের আওয়াজ পেলেন তিনি। দেখলেন, ড্রাইভারদ্বয় ভুট্টা ক্ষেতের পাশে চাদর বিছিয়ে দিনে দুপুরে দিব্যি নাসিকা গর্জনের ধ্বনি তুলে আরাম করে ঘুমুচ্ছেন। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

যাক, রশীদ সাহেব অতি সন্তর্পণে কাছে গিয়ে দরজা খুলে ব্যাগ নিয়ে কিছুটা জোরে হেঁটে ফিরে এলেন ভুট্টা ক্ষেতের অভ্যন্তরে, যেখানে অপেক্ষা করছেন তাঁর পরিজন। রশীদ সাহেবের কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে তাঁর স্ত্রী খাবার বের করতেই আঁতকে উঠলেন! এ কি হলো! রশীদ সাহেব কাছে গিয়ে দেখলেন, শুকনো খাবারের সাথে ডেটলের বোতলের মুখ খুলে মিলেমিশে সব একাকার হয়ে আছে। ফলে সব খাবার ফেলে দিতে হলো তাঁকে। হঠাৎ বাচ্চাগুলোর শুকনো মুখ নজরে এলো রশীদ সাহেবের। বোধকরি বাচ্চাগুলোও ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে আর খাবার চাইলো না তাঁদের কাছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন রশীদ দম্পতি। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না তাঁদের। স্ত্রীর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। উঠে গিয়ে দেখলেন, তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে তাঁরা। এদিক সেদিক অস্থির হাঁটাচলা করেই সময় পার করে দিলেন তিনি। এভাবে ঘণ্টা দুয়েক যাবার পর, ঘুম ভাঙ্গলো কুম্ভকর্ণদ্বয়ের। উঠেই হাঁক-ডাঁক। 'চালো চালো, দের হো গ্যায়া'। রাগে দুঃখে ফুঁসে উঠলেন রশীদ সাহেব। কিন্তু পাছে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়, তাই প্রকাশ করলেন না তিনি। সুবোধ বালকের মতোই পুত্র-কন্যার হাত ধরে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। ওদিকে গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। এবার গন্তব্য কোয়েটা। ৭০-৮০ কি. মি. গতিতে গাড়ি চলছে।

মাঝে মধ্যে ডান পাশ দিয়ে দু'একটা পণ্যবাহী ট্রাক দেখা গেলেও কোনো কার কিংবা বাস নজরে এলো না রশীদ সাহেবের। সুনসান ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তীব্রগতিতে এগিয়ে চলেছে রশীদ সাহেবদের গাড়ি। দু'পাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে দিগন্তের পানে। সবুজ-বন-বনানী

দেখতে ভালোই লাগছিলো। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট-বড় ঝর্না নেমে আসছিলো নীচে। কোনো কোনোটি জলপ্রপাতসম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চললো রশীদ সাহেবদের গাড়ি। এভাবে প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা গাড়ি চলার পর আবারও আরেক ভুট্টা ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়ালো গাড়ি। এবারের জায়গাটি একেবারে জন-মানবহীন নয়। ছোট ছোট খুপড়ির মতো দু'য়েকটা চায়ের টং ঘর দেখা গেলো—যেখানে দাঁড়িয়ে জটলা করে কিছু ট্রাকের ড্রাইভার চা পান করছিলেন। রশীদ সাহেবদের গাড়ি এসে থামতেই দু'একজন উৎসুক দর্শককে তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে এগুতে দেখা গেলো। সাথে সাথে ড্রাইভারদের একজন রশীদ সাহেবের কানে কানে কি যেন শিখিয়ে দিলেন। এতোক্ষণে তারা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উৎসুক দৃষ্টিতে গাড়ির ভেতরে তাকালেন তাদের একজন। জাতিতে সিন্ধি ওই লোকটি রশীদ সাহেবের দিকে একটু বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'কাহা জারা হা হো? মানে কোথায় যাচ্ছো। রশীদ সাহেবের তো গলা শুকিয়ে কাঠ। কিছুটা সাহস নিয়ে ড্রাইভারের শেখানো বুলি আওড়ালেন তিনি। কোয়েটামে ঘুমনে'—অর্থাৎ কোয়েটাতে ঘুরতে।

আর কোনো কথা না বলে অন্যদিকে চলে গেলো লোকটি। রশীদ পরিবারও যেন হাঁফ ছেঁড়ে বাঁচলো। যেহেতু ততোদিনে জাতিগত বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে, তাই বেশ ভয় পেয়েছিলেন তিনি। নিজের জন্য পরোয়া করেন না তিনি। তাঁর সব ভয় তাঁর পরিবারের জন্য। বিশেষত ছোট ছোট দুই পুত্র-কন্যা আর কোলের শিশু ফাইয়াজ। এদের জন্যই সব ভাবনা তাঁর। লোকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে ড্রাইভাররাও নেমে গেছে চা খেতে। কিন্তু এবার আর গাড়ি থেকে নামলেন না রশীদ পরিবার। চুপ করে বসে রইলেন তাঁরা গাড়ির মধ্যে। ওদিকে টং ঘরের ভীড়ও ক্রমশ কমতে লাগলো। ড্রাইভাররা যে যার মতো করে চলে যাচ্ছে আপন গন্তব্যে। কিন্তু রশীদ সাহেবের ড্রাইভারদের কোনো দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। বাচ্চাদের শুকনো মুখগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বাবা হয়ে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিইবা করতে পারেন তিনি এ মুহূর্তে। কোলের শিশুপুত্রটি—এদিক দিয়ে কিঞ্চিৎ ভাগ্যবান। সে তার মায়ের বুকের দুধ-পান করে ক্ষিধে মেটাচ্ছে। কিন্তু ওঁর বড় দু-ভাই বোনের সে সুযোগটিও

নেই। রশীদ সাহেব দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর গণ্ডদেশ বেয়ে নেমে যাচ্ছে দু'ফোটা অশ্রুধারা। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি। কিছুতেই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে চান না তিনি এ মুহূর্তে। সামনে আরও কতো পথ বাকি। বাচ্চাদের নিয়ে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যেতে পারবেন কিনা, তা আল্লাহই জানেন। অজানা আশংকায় ভরে উঠলো তাঁর মন। বাইরে তখন নিকষ কালো অন্ধকার।

যা হোক, একটু পর ড্রাইভাররা সিগারেটে লম্বা সুখ টান দিতে দিতে গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন ভয় পেয়েছে কিনা। রশীদ সাহেবের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তাঁরা। গাড়ি ছেড়ে দিলো। যাত্রা কোয়েটা। প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চলার পর তিন পাহাড়ের মাঝখানে হাইওয়ের পাশে আবার গাড়ি থামলো। কি ব্যাপার, ওই অন্ধকার রাতে এমন নির্জন জায়গায় গাড়ি থামলো কেন? রশীদ সাহেব আর তাঁর স্ত্রী এক অন্যের দিকে তাকাচ্ছেন। অজানা ভয় এসে ভর করলো তাঁদের শরীরে। ভয়ে গলার স্বর শুকিয়ে কোনো কথাও বের হচ্ছিলো না। হঠাৎই চোখে পড়লো দৃশ্যটা। রাস্তার ওপার থেকে ৭ থেকে ৮ জন সিন্ধি লোক অনেকটা দৌঁড়ে গাড়ির কাছে আসতে লাগলেন। নিশ্চিতই ভয়ে কুকঁড়ে উঠলেন তাঁরা। এবার বুঝি রক্ষে নেই আর। ভয়ে সন্তান দু'জনকে বুকে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে রইলেন। ওদিকে লোকগুলো গাড়ির পাশে এসে ড্রাইভার দু'জনের সাথে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলো। আর সে কি অট্টহাসি। হাসি যেন থামতেই চায় না। কি ব্যাপার, ঘটনাটা কি। নিশ্চয়ই এরা দুস্কৃতিকারী কিংবা ডাকাত দলের লোক নয়। থাকলে এতোক্ষণে সব কিছু নিয়ে নিতো। এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রশীদ সাহেব। ড্রাইভাররাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে এরা হচ্ছে তাঁদেরই লোক। এরা একটা বড় দলের সদস্য যারা কিনা লোক পারাপার থেকে শুরু করে স্মাগলিং এর সাথেও জড়িত। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তেই মূলত ঃ এরা এই কাজ করে থাকে। এর মধ্যে আর কি কি ঘটনা ঘটলো, কোথায় কোথায় অপারেশন চালিয়েছে তাঁরা, কতো লাভ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় গাড়ির ড্রাইভারদের অবহিত করছে ওরা। আর ড্রাইভার দু'জনও অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁদের কথাগুলো শুনছে। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করে আরও বিশদ তথ্য জেনে নিচ্ছে তাঁরা।

এভাবেই কেটে গেলো আরও প্রায় আধা ঘণ্টা। এরপর আস্তে আস্তে বিদায় নিলো সিন্ধি লোকগুলো।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। এবার বেশ জোর গতিতে গাড়ি চলছে। রশীদ সাহেব স্পীড মিটারে তাকিয়ে দেখলেন প্রায় ১০০ মাইল গতিতে গাড়ি চলছে। এতোক্ষণ ৭০-৮০ মাইলের বেশি গাড়ি চলেনি। ব্যাপারটা বোঝা গেলো একটু পর। গাড়ি এসে দাঁড়ালো হাইওয়ের পাশে অপেক্ষারত একটি ট্রাকের পাশে। ইতিমধ্যে রশীদ সাহেবের গাড়ি পেরিয়ে এসেছে কোয়েটা। তখন ছিলো রাত ৯টা আর এখন রাত ৩-৪ টা। ট্রাকটা দেখে মনে হলো কোনো পণ্যবাহী গাড়ি, উপরে খালি টুকরি রাখা যাতে বাইরে থেকে মনে হতে পারে, যে এটি কোনো পণ্য নিয়ে সীমান্ত পার হচ্ছে। ট্রাকটি কিন্তু খোলা নয়। কাভার্ড ভ্যানের মতো চারিদিকে আটকানো। পেছনে দরজা আছে, সেখান দিয়ে পণ্য ও উঠানামা করানো হয়। রশীদ সাহেবের পরিবারকে এবার গাড়ি থেকে নামিয়ে ট্রাকে তুলে দেয়া হলো। প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না তিনি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বিশেষ করে পাঁচ মাসের শিশু সন্তানের জন্যই তাঁর বিশেষ চিন্তা। কিন্তু ওরা কোনো কথাই শুনলো না। অনেকটা গলা ধাক্কা দেয়ার মতো করে অন্ধকার ট্রাকের ভেতর ঠেলে দিলো পাঁচ মানব সন্তানকে। ধাক্কা সামলে কোনো মতে ট্রাকে উঠতে গিয়ে রশীদ সাহেব দেখলেন ট্রাক ভর্তি মানুষজন। সবাই গাদাগাদি করে বসে আছে। নারী-পুরুষ শিশু সবাই আছে ওখানে। ওদিকে ট্রাকের মানুষগুলো পাঁচ জন নতুন মানুষ দেখে যারপর নাই বিরক্ত হলো। দু'য়েকজন অস্ফুট স্বরে বলেই ফেললো, আপদ-আসছে। যাই হোক, মুখে যাই বলুক না কেন পাকিস্তানী দালালদের সামনে কিছু বললেন না তাঁরা। সবারই মৃত্যু ভয় রয়েছে। কে আর ঝামেলা পোহাতে চায়। রশীদ সাহেব প্রথমে ট্রাকে উঠে টেনে তুললেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের। ভেতরে লোকজন গাদাগাদি করে আছে বিধায় জায়গা হচ্ছিলো না। পাশ থেকে অন্ধকারে কে একজন যেনো রশীদ সাহেবের বড় ছেলে অহনকে কোলে বসিয়ে বললো, 'দিন বাচ্চাটাকে আমার কোলে দিন।' রশীদ সাহেব যেন হাঁফ ছেঁড়ে বাঁচলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

ইতিমধ্যে ট্রাক চলতে শুরু করলো। আর ভেতরে মুরগির খোয়াড়ের

মতো শ'খানেক মানুষ নিয়ে এগিয়ে চললো পণ্যবাহী ট্রাক। যথারীতি ড্রাইভার কিন্তু ওই দু'জনই। কার থেকে ট্রাকে ওঠার সাথে সাথে ড্রাইভার দু'জনও গাড়ি বদলিয়ে নিলেন। সেহেতু ওই দুর্গম রাস্তা—ঘাট তাঁদের চেনা-জানা। তাই সীমান্ত অভিমুখে তাঁদেরই পাঠানো হয়েছে। এর আগে ট্রাকে ওঠার সময়ে ভেতর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠ এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলো পানির জন্য। সবার গলা শুকিয়ে কাঠ। দালালদের একজন জোরে

ধমক দিলো, 'পানি নেহি হে, মর্ যাও।' ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। ভেতরের চিৎকারগুলো সহসাই থেমে গেলো। দু'একজন বাচ্চার মুখগুলো চেপে ধরলেন তাঁদের বাবা-মা। এদিকে রশীদ সাহেবের ছোট ছেলের চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সবাই। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না তাঁকে। এতোটুকুন বাচ্চা, সেও সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে মনে হলো। ওদিকে অন্ধকারে কারও মুখ দেখা না গেলেও সবার নিশ্বাস নেবার শব্দ বেশ জোরে পাওয়া যাচ্ছে। সেই নিশ্বাসের শব্দই বলে দিচ্ছে, কতোটুকু ভয় পেয়েছে আশ্রয়হীন ওই মানুষগুলো। রশীদ সাহেব পুত্র-কন্যাদের ধরে বসে রইলেন, পাছে তাঁরা আবার হারিয়ে না যায়।

এভাবে কতোক্ষণ কেটে গেলো বলা মুশকিল। কারণ, ঘড়ি দেখারও কোনো উপায় নেই। পাশ থেকে হঠাৎই এক মহিলার ডুকরে কান্নার শব্দ শোনা গেলো। বোঝা গেলো কান্না আটকে রাখার কি চেষ্টাই না করছেন তিনি। তাঁর কান্নার শব্দে রশীদ সাহেবেরও জোরে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো, কাঁদলে বোধ হয় একটু হাল্কা হওয়া যাবে। কিন্তু সে উপায় নেই এখন। জীবনমৃত্যুর দোলাচলে দুলছে ট্রাকে থাকা লোকগুলো। হঠাৎই কঠিন শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়ালো চলন্ত ট্রাকটি। ভয়ে কুকঁড়ে উঠলো ট্রাক ভর্তি মানুষজন। কি ব্যাপার, পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেলো নাকি সব গোপন পরিকল্পনা? তাহলে তো নিশ্চিত মৃত্যু। মৃত্যু ভাবনা পেয়ে বসলো রশীদ সাহেবদেরও। স্ত্রীর হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি। যেন শেষ মুহূর্তেও এ বন্ধন অটুট রাখতে চান তিনি। ট্রাকের বাকি সব মানুষজনও ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন।

হঠাৎই খুলে গেলো ট্রাকের পেছনের ডালা। চাঁদের আলোয় রশীদ সাহেব দেখলেন সেই দুই ড্রাইভার ট্রাকের কাছে এসে কাকে যেন খুঁজছে।

হঠাৎই রশিদ সাহেবের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তাঁর। রশীদ সাহেবের

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুম, তুমহারা ফ্যামিলি লিয়ে বাহার চালে আও।' কি ব্যাপার। ট্রাকে এতো লোক থাকতে শুধু রশীদ পরিবারকে কেন নামতে বলছে ওরা। ব্যাটাদের খারাপ মতলব নয়তো। এমনি নয়-ছয় ভাবতে ভাবতে অগত্যা স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। আল্লাহ্ কপালে যা রেখেছে তাই হবে। এতো ভয় পাবার কি আছে। মরতে তো একদিন হবেই।

ট্রাকের পেছন থেকে ড্রাইভার দু'জন সামনের ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলো। রশীদ সাহেব পরিবার নিয়ে ইতস্তত, রাস্তায় দাঁড়িয়েই রইলেন। কিয়া হুয়া, চালে আও।' এতোক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। ড্রাইভারদের নির্দেশ অনুযায়ী এবার সামনে ড্রাইভারের সিটের পাশের জায়গায় গিয়ে বসলেন পুরো পরিবার নিয়ে। পাকিস্তানের এই ট্রাকগুলো বেশ প্রশস্ত। আমাদের দেশের মতো এতো সরু শরীর নয় তাদের। ফলে ড্রাইভার, তাঁর পাশে আরেকজন ড্রাইভার এবং তাঁর পাশে পুরো রশীদ পরিবার—সবারই জায়গা হয়ে গেলো। যাক, এতোক্ষণে বোঝা গেলো এই পরিবর্তনের কারণ। রশীদ পরিবারের প্রতি সহানুভুতি দেখিয়ে ড্রাইভার দু'জনের এই সিদ্ধান্তে অভিভূত হলেন তিনি। মনুষ্যত্ব বোধ করি পৃথিবী থেকে এখনও বিলীন হয়ে যায় নি। পেশায় স্মাগলার হলেও ওরাও নিশ্চয়ই কারও ভাই, কারও বাবা কিংবা কারো ছেলে।

যাই হোক, রশীদ সাহেবও মাথা নেড়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। সাথে তাঁর স্ত্রীও। ইতিমধ্যে বড় ছেলে মেয়ে দু'টো ধকল আর ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট শিশু পুত্রটিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে গাড়ি চলছে তীব্র বেগে। সাঁই সাঁই করে পেরিয়ে যাচ্ছে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত আর আকাশের তারকারাজি। পালাক্রমে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওয়াহাব আর কাদের ড্রাইভারদ্বয়। সাথে চলছে অনর্গল কথাবার্তা। বিয়ে, প্রেম, সুন্দরী তরুণী, সিনেমা, অন্যান্য বন্ধুদের সম্পর্কে কটুক্তি, পারিবারিক কথোপকথন, ছেলেমেয়ে সর্বোপরি চলমান রাজনীতি কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কথাবার্তা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-রসিকতা আবার মাঝে-মাঝে ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাঁরা। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাংলাদেশ

বাঙালি কিংবা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটিও বাজে কটূক্তি করলেন না তাঁরা। বরং নিজ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রহীন, ধূর্ত, কপট, ঘুষখোর, নারীলোভী সর্বোপরি হন্তারক সম্বোধনেও আখ্যায়িত করলেন। রশীদ পরিবারের ওদের কথাবার্তা শোনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। অবশ্য ইচ্ছেও করছিলো না তাঁর, তাঁদের কথাবার্তা শোনার। কিন্তু কান তো বন্ধ করা যাচ্ছে না।

রশীদ সাহেবের মাথায় তখন রাজ্যের চিন্তা। পুরো পরিবার নিয়ে আদৌ নিজ মাতৃভূমিতে পৌঁছাতে পারবেন কিনা। নাকি পাকিস্তানি স্মাগলাররা টাকা-পয়সা নিয়ে মৃত্যুকূপে ফেলে দেবেন তাঁদের। যেহেতু দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এবং পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছে তাই তাঁদের প্রতিশোধ স্পৃহা থাকাটাই স্বাভাবিক। আমরা যেমন নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসি। রক্ত দিয়ে হলেও দেশের ঋণ শোধ করতে চাই। তাঁরাও তো তেমনই হবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া রশীদ সাহেবের মতো নিরীহ মানুষরা এ মুহূর্তে তাঁদের উপর নির্ভর করা ছাড়া এই নির্জন বিদেশ-বিভূঁইয়ে আর কিইবা করতে পারেন। সুতরাং এ মুহূর্তে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না তাঁর।

ওদিকে ট্রাক ছুটে চলছে তার নিজস্ব গতিতে। রাস্তাঘাট নির্জন বিধায় ট্রাকের ইঞ্জিনের তীব্র শব্দ বড্ড কানে লাগছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ট্রাকের খোলা জানালা দিয়ে সেই বাতাস ভিতরে এসে ঢুকছে। রশীদ সাহেব হাত বাড়িয়ে জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, জানালা আটকানোর কোনো লক্ নেই। অগত্যা হাত দিয়ে জানালাটা ধরে রইলেন কিছুক্ষণ। ওদিকে বড় ছেলে অহন জেগে উঠেছে ততোক্ষণে। উঠেই খাবার চাইলো। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তাঁর। কিন্তু চলন্ত এই ট্রাকে খাবার পাবেন কোথায় তিনি। স্ত্রীর দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে চাইলেন। স্ত্রী ব্যাগ হাতড়ে ছোট একটা পানির বোতল বের করে এগিয়ে ধরলেন অহনের মুখে। 'বাবা, একটু পানি খেয়ে নাও। একটু পরেই তোমাকে খাবার কিনে দেবো। লক্ষী বাবা আমার।' বলেই পরম মমতায় অহনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। রশীদ সাহেবের চোখ ছলছল করে উঠলো। নিজেকে সামলে আড়ালে চোখ মুছলেন তিনি। মনে মনে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'হে খোদা, তুমি তো সবই জানো। শুধু দেশ আর প্রিয়তম মাতৃভূমির জন্যই আমাদের

এই অনিশ্চিত যাত্রা। তুমি এ যাত্রায় আমাদের সবার সহায় হও। আমাদের সহি-সালামতে দেশে ফিরিয়ে নিও হে রাব্বুল আলামিন। আমাদের নতুন দেশকে শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিও, হে পাক পরওয়ার দিগার। যারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে দেশের জন্য সম্মুখযুদ্ধে লড়েছেন, সেই সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তুমি সম্মানের সাথে সুখে রেখো, আমীন।' বলেই থামলেন রশীদ সাহেব।

ততোক্ষণে ট্রাক এসে থেমে গেছে নির্জন রাস্তার পাশে এক কোণে। কি ব্যাপার, আবার কি হলো। ট্রাক থেকে নেমে দাঁড়ালেন দু'জন চালক। নিজেদের মধ্যে কি যেন বিড় বিড় করলেন। হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে দূরে কি যেন দেখার চেষ্টা করলেন দু'জন। বোধ হয় কারও জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা। ওদিকে রশীদ পরিবার আবারও অজানা আশংকায় দুলছেন। কি ব্যাপার, হঠাৎই ড্রাইভার দু'জনের কি হলো? কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নয়তো। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে হঠাৎ খেয়াল করলেন, একটা সাদা রংয়ের প্রাইভেট গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। ড্রাইভার দু'জন বেশ ঝুঁকে প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারের সাথে জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে কথা বলছে। রশীদ সাহেব খেয়াল করলেন, প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বারবার রশীদ সাহেবকে ইঙ্গিত করে কি যেন বলছিলেন আর ড্রাইভারদের কথা শুনে বারবার মাথা নেড়ে না বলছিলেন।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর ট্রাকের ড্রাইভার দু'জন প্রাইভেট গাড়ির পাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে আসতে থাকলেন। দু'জনের মুখেই বেশ স্মিত হাসি। কিঞ্চিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন রশীদ সাহেব। ততোক্ষণে প্রাইভেট গাড়িটি রাস্তায় মিলিয়ে গেছে। ড্রাইভার দু'জন ড্রাইভিং সিটে না বসে ওপাশ ঘুরে রশীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে ট্রাক থেকে নামতে বললেন। কি ব্যাপার! হঠাৎই নামতে বলছে কেন ওরা। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। ওদিকে তাঁর স্ত্রীও তাঁকে নামতে দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু ওরা জোর করাতে অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও নামতে হলো তাঁকে। সাথে পুরো পরিবার। এবারে ড্রাইভার দু'জন রশীদ সাহেবের কাছে এসে ভয় পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলো। রশীদ সাহেবের মৌনতা দেখে আবারও দু'জনই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'আরে ভয় নেই, ভয় নেই। আমরা এতোটা খারাপ না পাকিস্তানীদের মতো।
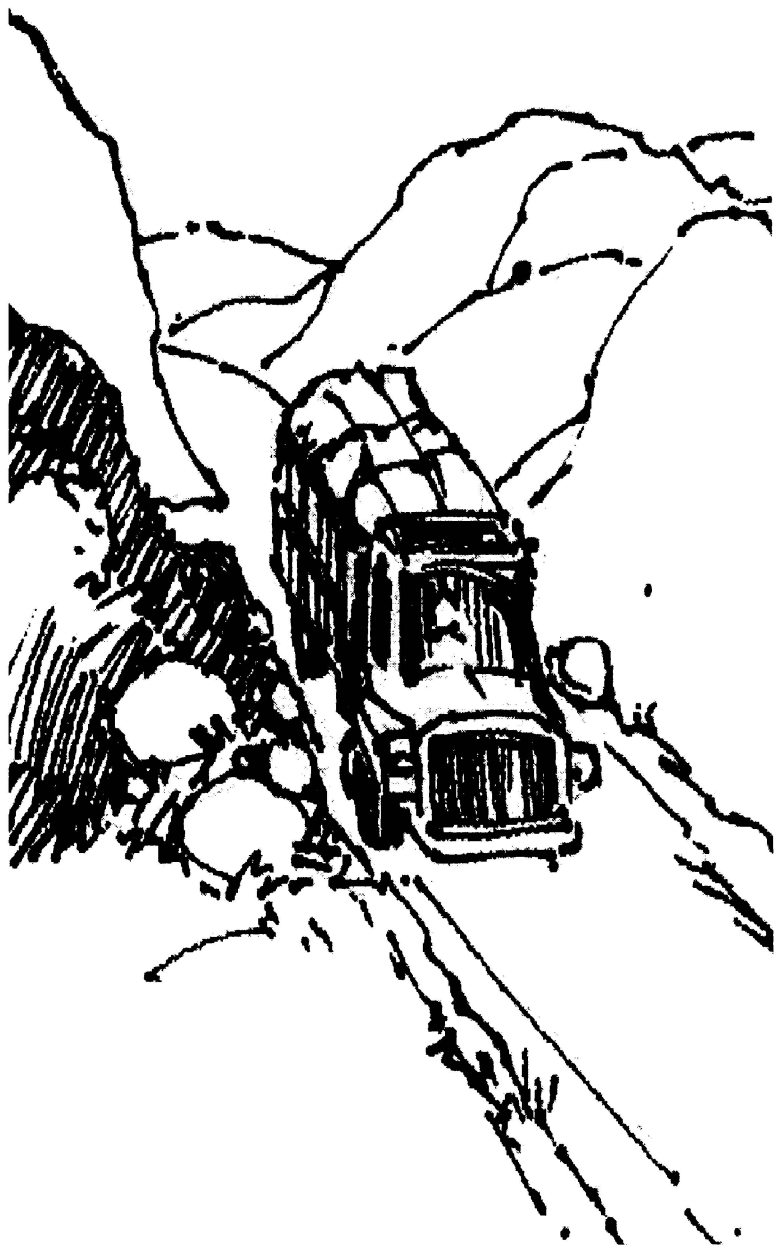
যদিও আমরাও পাকিস্তানী। কিন্তু দেখছো না, তোমাদের সহযোগিতা করছি আমরা। ইচ্ছে করলে তো তোমাদের যে কোনো জায়গায় রেখেই চম্পট দিতে পারি আমরা। কিন্তু আমরা সিন্ধি। জবান যখন দিয়েছি তখন তোমাদেরকে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবোই।' বলেই থামলেন ড্রাইভারদের একজন। পুরো কথাগুলোই তাঁরা বলছিলেন উর্দুতে। এবারে রশীদ পরিবার যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। এরপর ওরা বললেন,' আর কিছুদূর গেলেই বর্ডার এলাকা শুরু। ওপারে কান্দাহার। এখান থেকেই রাস্তায় বিশেষ বর্ডার ফোর্স থাকবে। তাঁরা একটু পরপরই গাড়ি চেক করতে আসবে। তোমাদের এখানে দেখলে বড় বিপদ হয়ে যাবে। আমরা ট্রাকটা পণ্যবাহী যান হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি নিয়ম অনুযায়ী। তোমাদের উপর একটু মায়াও জন্মেছে আমাদের। তাই তোমাদের অন্যভাবে নিয়ে যাবো আমরা। যদিও বিষয়টা একটু রিস্কি, তবুও তোমাদের জন্য এই রিস্ক আমরা নেবোই।' কি সেটা। হাতের ইশারায় এবার রশীদ পরিবারকে ট্রাকের পেছনের ছোট্ট সিড়ি বেয়ে ট্রাকের ছাদে উঠতে বললেন তাঁরা। 'শোনো, ট্রাকের ছাদে উঠে সবাই একদম শুয়ে পড়বে অর্থাৎ আকাশের দিকে থাকবে তোমাদের দৃষ্টি। এপাশ ওপাশ করবে না একদম। যেহেতু এটা পণ্যবাহী ট্রাক, সুতরাং-এর ছাদের চারপাশ প্রায় দু-আড়াই ফুট উঁচু করে তৈরি করা যাতে মালপত্র রাখা যায়। ওখানেই তোমরা শুয়ে থাকবে আর আমরা বর্ডার পেরিয়ে যাবো। কিন্তু সাবধান, কেউ ভুলেও কোনো আওয়াজ করবে না, এমনকি ছোট্ট শিশুটিও। যদি শিশুটি চিৎকার করে বসে, তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরবে। চিৎকার করলেই তোমাদের নিশ্চিত মৃত্যু। বুঝতে পেরেছো?' বলেই থামলেন ড্রাইভারদের অন্যজন। রশীদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সাথে সাথে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতেও ভুললেন না। এরপর ঝটপট ট্রাকের ছাদে ওঠার জন্য তাড়া করতে লাগলেন ড্রাইভারদ্বয়। রশীদ পরিবারও কোনো কথা না বলে উঠে যেতে লাগলেন সিড়ি বেয়ে ট্রাকের ছাদে। প্রথমে রশীদ সাহেব পরে বাচ্চা দু'জন এবং কোলের শিশু। সর্বশেষে রশীদ সাহেবের স্ত্রী। ড্রাইভাররাও সাহায্য-সহযোগিতা করলো বেশ। যাক্ জিনিসপত্র দু'টো পায়ের কাছে রেখে এবারে সটান হয়ে শুয়ে আকাশ দর্শন। পাঁচ বঙ্গসন্তানের বেঁচে থেকে মাতৃভূমিতে ফেরার সেকি আকুতি। দুই পাশে রশীদ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। মাঝে তিন

সন্তান। রশীদ সাহেব একটু ভয় পাচ্ছিলেন ছোট ছেলেটার কথা মনে করে। বারবার স্ত্রীকে ইশারা করছিলেন ওর দিকে নজর রাখার জন্য। ওদিকে বড় মেয়ে উপলা এবং বড় ছেলে অহন তখন একেবারে নির্বাক, নিশ্চুপ। প্রচণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে চিৎকার করার শক্তিটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। দু'ভাই বোনই পরস্পর জড়াজড়ি করে শুয়ে আকাশে চরকা কাটা চাঁদের বুড়িকে খুঁজছে। রশীদ সাহেবের তখন যতো চিন্তা ছোট ছেলে ফাইয়াজকে নিয়ে। মাত্র ছয় মাস বয়সী কোলের শিশু তো আর এতো কিছু বোঝে না। যদি কোনো কারণে চিৎকার করে ওঠে, তাই নিয়ে চিন্তিত তিনি। বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছেন আর স্ত্রীকে ইশারা করছেন খেয়াল রাখতে।

ওদিকে ততোক্ষণে ট্রাক আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিকে খোলা থাকায় বেশ বাতাস বইছে। উপলা আর অহনের বেশ শীত লাগছে। কিন্তু গায়ে দেবার মতো কিছুই নেই তাদের। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দু'টো শীতে কুঁকড়ে আছে। রশীদ সাহেবের মনটা কেঁদে উঠলো। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন দু'জনকে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকলেন তাদের। বাচ্চা দু'টোও বাবার হাতের নীচে আশ্রয় খুঁজতে লাগলো। ওদিকে রশীদ সাহেবের স্ত্রী ব্যস্ত ছোট শিশুটিকে নিয়ে। ভয়ে আর আতংকে আছেন তিনিও। পাছে শিশুটি কোনো কারণে কেঁদে ওঠে। ড্রাইভারদের কথানুযায়ী তখন তো মুখ চেপে ধরে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। মা হয়ে কি করে করবেন তিনি তা। কিন্তু কি আশ্চর্য। এতোটুকুও চিৎকার কিংবা কাঁদার লক্ষণ নেই শিশুটির চেহারায়। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে সেও। সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে স্মরণ করলেন রশীদ সাহেবের স্ত্রী। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার মন। আকাশের দিকে তাকালেন রশীদ সাহেব। সারি সারি তারকারাজি আর দূরে সপ্তর্ষীমণ্ডল। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার না থাকায় চাঁদ মামাকে আবছা দেখা যাচ্ছে। দু'পাশের গাছগাছালি সাঁই সাঁই করে পেছনে চলে যাচ্ছে। পেছনে পড়ে থাকছে অজস্র স্মৃতি। করাচীর স্মৃতি, বাসার স্মৃতি, হাসপাতালে প্রথম সন্তান জন্ম হওয়ার স্মৃতি, বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতি, ব্যাচেলর জীবনের স্মৃতি। স্মৃতির কোনো শেষ নেই। মনে আছে, প্রথম সন্তান উপলা জন্ম নেবার সময়টা। সেটা ১৯৬৫ সাল। রশীদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া সে সময়

তাঁদের সাথে কেউই ছিলো না। অনেকটা টোনাটুনির সংসারের মতো। এমনকি বাসায় কোনো কাজের লোকও ছিলো না। সব কাজই রশীদ সাহেবের স্ত্রী তাঁর নিজ হাতে করতেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায়, সব কাজই করতে হতো রশীদ সাহেবকেই। সকালে নাস্তা করে স্ত্রীর জন্য দুপুরের খাবারের জোগাড় করে তবেই অফিসে যাওয়া। আবার অফিস শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্ত্রীর আদর যত্ন করা। সর্বোপরি রান্না-বান্নার জোগাড়–এভাবেই কাটছিলো তখনকার সময়গুলো। সন্তান প্রসবের দিন যতোই ঘনিয়ে আসছিলো, রশীদ সাহেবের স্ত্রীর ততোই শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটছিলো। শেষে চিকিৎসকের পরামর্শে সন্তান জন্মদানের নির্ধারিত তারিখের চেয়ে অনেক আগেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো তাকে। হাসপাতালটি হলো করাচীর সোলজার বাজারে অবস্থিত বিখ্যাত হলি ফ্যামিলী হসপিটাল। কিন্তু সমস্যা হলো, স্ত্রীর পাশে সারাদিন থাকবার মতো কেউ নেই। বাংলাদেশে যেমন কোনো মেয়ের সন্তান জন্মের সময় বাবার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির লোকজনে মুখরিত থাকে হাসপাতাল আর ক্লিনিক প্রাঙ্গণ, কিন্তু এখানে তাঁদের কোথায় পাবেন রশীদ সাহেব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো রশীদ সাহেবকে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই যারা হাসপাতালে দু-দণ্ড থাকতে পারে। এ কথা জেনে হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সরা তাঁদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো। ডাক্তার সাহেব তো প্রকাশ্যে বলেই ফেল্লো, কোনো ভয় নেই রশীদ সাহেব। আমরা তো আছি। We are Muslim brothers। উপরে আল্লাহ আছে, ভয় পাবেন না। কর্তব্যরত নার্সরাও বেশ দেখাশোনা শুরু করে দিলেন। রশীদ সাহেবের স্ত্রী ঠিকমতো খাবার খাচ্ছেন কিনা, ঔষধপত্রের কি খবর, কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানতে তারা সবসময় উদগ্রীব ছিলেন। আর এতে করে রশীদ সাহেব যেন বেশ স্বস্তি পেলেন। যাক্, দুশ্চিন্তা বেশ খানিকটা কমলো বোধ হয়।

ওদিকে রশীদ সাহেবও অফিস শেষ হবার সাথে সাথেই অনেকটা দৌড়ে চলে আসতেন হাসপাতালে। তাকে দেখে রশীদ সাহেবের স্ত্রীর সে কি আনন্দ। মনে হয়, কতোদিন পর দেখা হলো দু'জনের। রশীদ সাহেব সাথে কিনে আনা আপেল, কমলা, আঙ্গুর জোর করে খাওয়াতে চাইতেন তার

স্ত্রীকে। কিন্তু তার স্ত্রী এগুলোর কিছুই খেতে চাইতেন না। রশীদ সাহেবও নাছোড়বান্দা। সে এক দৃশ্য বটে। হাসপাতালের নার্সরাও দূর থেকে এ দৃশ্য থেকে স্মিত হেসে না দেখার ভান করে চলে যেতেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন, তাঁর স্ত্রীর একটু সমস্যা আছে। সন্তান জন্মদানের সময় বেশ সতর্ক থাকতে হবে। শুনেই মন খারাপ হয়ে গেলো রশীদ সাহেবের। প্রথম সন্তান বলে কথা, কিন্তু স্ত্রীর বারংবার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই বললেন না তিনি। পাছে তিনি ভয় পান। কিন্তু রশীদ সাহেবের ভয় ঠিকই পেয়ে বসলো। কলোনির বাসায় ফিরে কোনো কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিলেন না। কি রান্নার সময়, কি খাওয়ার সময়, কি ঘুমানোর সময়। চোখ দুটো এক করলেই বীভৎস দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর। একদিকে অনাগত সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা, অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থা। রশীদ সাহেব চিন্তার কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না।

যথারীতি সন্তান প্রসবের সময় অতিরিক্ত টানাটানির কারণে তাঁর সন্তানের কানের একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। রশীদ সাহেবের সেজন্য সে কি মন খারাপ। এমনিতেই কন্যা সন্তান, তাঁর উপরে এ অবস্থা হলে, ভবিষ্যত তো অন্ধকার। কিন্তু ডাক্তার অভয় দিয়ে বললেন, 'আরে এতো ভয়ের কি আছে। আরও কতো ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে। আর ওটা কান ছেঁড়া কে বলেছে। দু-সপ্তাহ এখানে থাকলে আপনি নিজেও টের পাবেন না। এতোক্ষণে ভয় আর দুশ্চিন্তা কেটে গেলো রশীদ সাহেবের সাথে তাঁর স্ত্রীরও। মনে আছে, সেবার প্রায় ২১ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো তাঁর স্ত্রী আর উপলাকে। সত্যিই তাই, পরবর্তী সময় উপলার কানে কোনো দাগেরও চিহ্ন পাওয়া গেলো না। সেই সময় ডাক্তার আর নার্সরাও ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ডাক্তারী পেশার যে মূল মন্ত্র অর্থাৎ মানবতার সেবা—সে ধর্মে পুরোপুরি নিবেদিত ছিলেন তাঁরা। তবে এটাও ঠিক, সেই সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আর জীবনযাত্রার ব্যয় খুবই অল্প ছিলো। ফলে আর্থিক কষ্টে কেউ না খেয়ে থাকেন নি।

তবে সময়ের সাথে সাথে ডাক্তারদের জীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলেও সেবার সেই ধর্মে বর্তমানে যেন কোথায় কমতি। এখনকার ডাক্তারদের অতি

বাণিজ্যিক মানসিকতার কারণে মানতবার সেবা আজ বিলীন প্রায়। যার কারণে দেশে ভালো হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও আজ একটু হলেই আমরা ছুটি থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কিংবা নিদেনপক্ষে কলকাতা। বাংলাদেশের ডাক্তারদের ওপর থেকে আমাদের ভরসা প্রায় উঠেই গেছে বলা যায়।

যাই হোক, পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে অহন এবং ১৯৭২ সালে ফাইয়াজ জন্ম নিলে তাদের মাত্র সাত দিন করে সেই হলি ফ্যামিলি হসপিটালেই কাটাতে হয় তাঁর স্ত্রীর। অবশ্য ততোদিনে রশীদ সাহেবের ছোট দু'ভাই এবং ভাইয়ের বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীও পালাক্রমে ঘর পাহারা দিয়েছেন। ফলে প্রথম

সন্তান হবার মতো নিঃসঙ্গ আর একাকী ছিলেন না রশীদ সাহেব। আজ সেই স্মৃতিময় জীবন ছেড়ে এ কোন অনিশ্চিত পথে যাত্রা করছেন তিনি। কোথায় যাচ্ছেন, আদৌ পৌছুঁতে পারবেন কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের কোনো জবাব নেই তার কাছে। শুধু এতোটুকুই জানেন, দেশে ফিরতে হবে। প্রিয়তম মাতৃভূমি যেনো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ আকর্ষণ অগ্রাহ্য করার অসীম ক্ষমতা কি আছে তাঁর। হঠাৎই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রাক। কি ব্যাপার আবার কি হলো। এখন একটুতেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন রশীদ সাহেব। আন্দাজ করতে পারছেন সে, সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছেন তাঁরা। ভয় হচ্ছে, সীমান্ত অতিক্রম করা নিয়ে। সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি হিসেবে পার পাওয়া যাবে তো। নাকি ধরা পড়ে সারাজীবনের হাজতবাস। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কি হবে তাহলে। নাহ, পাগলই বোধ হয় হয়ে যেতে হবে তাঁর। পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ড্রাইভার দু'জনের গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। কারও সাথে যেন কথা বলছে। কান পেতে সেই কথা শোনার চেষ্টা করলেন রশীদ সাহেব। নাহ, কিছুই শোনা যাচ্ছেন না। কোয়েটা ছেড়ে এসেছেন সেই কখন। কিন্তু সীমান্ত আর আসছে না। আসবেই বা কি করে। তারা তো আর স্বীকৃত কোনো সীমান্ত দিয়ে যাচ্ছেন না। সীমান্তের পাশের চোরা রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচ্ছে ট্রাক। বাংলাদেশ আর ভারতের সাথে যেমন প্রচুর স্বীকৃত সীমান্ত রয়েছে পাশাপাশি প্রচুর চোরা সীমান্তও রয়েছে। শোনা যায়, ওইসব চোরা সীমান্ত

দিয়ে দু'দেশের অধিবাসীদের পাশাপাশি চোরাকারবারীদের রয়েছে অবাধ বিচরণ। আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা এগুলো জেনেও অনেক সময় না জানার ভান করে। মাঝেমধ্যে কিছু চোরাকারবারী ধরাও পড়ে তাদের হাতে। কিন্তু তার সব কিছুই সঠিক লেন-দেন না হবার কারণে এবং অনেকটাই আই-ওয়াশ। তেমনি এক পথেই রশীদ সাহেবদের ট্রাক এগিয়ে চলেছে।

যা হোক, ড্রাইভার দু'জন আবার সামনের আসনে বসলেন। ট্রাক আবার চলতে শুরু করলো। এবার আর পাশ দিয়ে কোনো গাড়ি চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। প্রধান সড়ক থেকে ট্রাক ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য-রাস্তায় প্রবেশ করেছে। রাস্তার অবস্থা যে খুব কাহিল, উপরে শুয়ে শুয়ে বেশ টের পাচ্ছেন তিনি। মাঝে মাঝে ইটের রাস্তায় চলার ঘড় ঘড় শব্দ। আবার মাঝে মাঝে মাটির রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে ট্রাক। মাটির রাস্তা মাঝে মধ্যেই খানা-খন্দে ভরা। বাচ্চা দুটোর উহ্-আহ্ শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। নিজেরও খুব কষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে, স্ত্রী এবং ছোট শিশু পুত্রটির। পাছে ছোট শিশুটি ব্যাথা পায় তাই তাঁর স্ত্রী বাচ্চাকে বুকের মাঝে আটকে রেখেছেন। এই হচ্ছে মা, মমতাময়ী মা।

এতোক্ষণে বুঝতে পারলেন রশীদ সাহেব যে, তারা নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছেন। ভয় জেঁকে বসলো রশীদ সাহেবের মনে। সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে স্মরণ করতে লাগলেন তিনি। খানাখন্দ পেরিয়ে ওদিকে ট্রাক ছুটছে তো ছুটছেই। কখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনো গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে কখনো বা ইটের রাস্তা দিয়ে বিকট বিশ্রী শব্দে ছুটে চলেছে ট্রাক। ছুটছে তো ছুটছেই। এ প্রতীক্ষার আর শেষ নেই। প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা চলার পর জোরে ব্রেক কষে কোথাও থামলো ট্রাকটি। ঘড়িতে তখন রাত ৯ টা। ড্রাইভারদের একজন নীচে থেকে সজোরে ডাকলেন রশীদ সাহেবকে। রশীদ সাহেব শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে নীচে তাকিয়ে দেখলেন আধো-অন্ধকারে তিন-চারটি মাটির ঘর দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ট্রাকের ভেতরে অবস্থানকারী সকলে নেমে দাঁড়িয়েছে। রশীদ সাহেব পুরো পরিবার নিয়ে এবার নীচে নামলেন। বড় ছেলে মেয়ে দুটোর চেহারার দিকে তাকানো যায় না। শিশু-পুত্রটি তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ড্রাইভারদের একজন ইশারায় ডাকলেন।

কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন পকেটে টাকা-পয়সা আছে কিনা। রশীদ সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়তেই বললেন, ওই মাটির ঘরে আফগান উপজাতিদের বাস। ওরা তোমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছে। যাও, ওখান থেকে কিনে কিছু খাওয়াও তোমার পরিবারকে।'

ব্যস, আর যায় কোথা। হুড়মুড়িয়ে ট্রাকের সব ক্ষুধার্ত মানুষ দৌড়ে গেলো মাটির ঘরগুলোর দিকে। রশীদ সাহেবও পরিবারের সদস্যদের এক কোণায় দাঁড় করিয়ে দৌড়ে গেলেন ওখানে। ভীড় ঠেলে তিন-চারটা হাতে বানানো মোটা মোটা রুটি এবং উপজাতীদের তৈরি করা এক ধরনের সবজি তরকারি কিনলেন। একেকটি রুটির দাম চার আনা। সব মিলিয়ে ব্যয় হলো দু'টাকা। খাবার হাতে পেয়েই ছুটলেন পরিবারের সদস্যদের কাছে। এতোক্ষণে উদগ্রীব হয়ে থাকা ছেলেমেয়ে দু'টোর চোখ-খাবার পেয়ে চক্‌চক্‌ করে উঠলো। তাঁরা গো-গ্রাসে গিলতে লাগলো খাবারগুলো। সবারই তখন একই অবস্থা। খাবার হাতে নিয়ে যে যেখানে পারছে বসে পরে গো-গ্রাসে গিলছে খাবার। এ যেন ডিস্‌কভারী কিংবা এনিম্যাল প্ল্যানেট-এ প্রদর্শিত ক্ষুধার্ত সিংহ কিংবা নেকড়ের দলের হরিণ শাবক কিংবা বন্য গরু হত্যার পর ভোজন দৃশ্য। কারও দিকে তাকানোর সময় নেই কারও। মনে হচ্ছে, গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে অভুক্ত রয়েছে এই মানুষগুলো। দেশে ফেরার সে কি উন্মাদনা তাদের মনে। তাই তো মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে স্বদেশের পানে বীর বাঙালিরা। এভাবে কেটে গেলো প্রায় আধা ঘণ্টা। এবারে আবার তাড়া দিতে লাগলেন ড্রাইভাররা। 'চালো চালো, উঠো উঠো, সাবলোক। গাড়িমে ব্যাঠ যাও।' অতঃপর উঠে দাঁড়ালো সবাই। কারও মুখে কোনো কথা নেই। বাকরুদ্ধ আর বোবা মানুষগুলো আবার উঠে গেলো যার যার আসনে। আসন তো নয় ট্রাকের মেঝেতে। গাদাগাদি করে পণ্যবাহী ট্রাকের পণ্য হিসেবেই যাদের পরিচিতি এখন।

যথারীতি ট্রাক আবার চলতে শুরু করলো। সাথে চললো রশীদ সাহেব পরিবারের আকাশ দর্শন। এই যাত্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দু'টোর চেহারা বেশ উৎফুল্ল। পেটে খাবার পড়াতে ক্ষিধে নেই আর। রশীদ সাহেবের স্ত্রীও বেশ খুশি। যাক্‌, বাচ্চা দু'টোর তো আর ক্ষিধে নেই। নিজেরা দু'দিনও না

খেয়ে থাকতে পারবেন। কিন্তু ওদের চিন্তায়ই আচ্ছন্ন ছিলেন এতোক্ষণ। রশীদ সাহেব তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ইনশাআল্লাহ, আমরা পৌঁছে যাবো কান্দাহারে। আর কোনো ভয় নেই।' তাঁর স্ত্রীও এ কথায় উৎফুল্ল হলেন। বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তিনি। এভাবেই কাটতে লাগলো সময়। একটা সময় মনে হলো ট্রাকের গতি কমছে। সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়লো। ড্রাইভারদের একজন নীচে নেমে ট্রাকের পেছনের ডালা খুলে দিয়ে সবাইকে নামতে বললেন। চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা এখন মুক্ত। আর কোনো ভয় নেই। আমরা পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে এখন আফগানিস্তানে। তোমরা নেমে এসো। তোমাদের এখুনি আবার রাতের রিজার্ভ করা বাসে চড়ে রাজধানী কাবুল পৌঁছুতে হবে। জলদি করো।'

উল্লাসে ফেটে পড়লো আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। দু'হাত তুলে তাদের কেউ কেউ জয়ের ভঙ্গী দেখাচ্ছে। কেউ দু'আঙুলে 'ভি' চিহ্ন দেখাচ্ছে, কেউ বা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যেন মৃত্যুকূপ থেকে ফিরে আসা নিরস্ত্র আর অসহায় মানুষগুলো। রশীদ পরিবারও সেই আনন্দে সামিল হলেন। তাঁরাও চিৎকার করে কাঁদছে আর ছেলেমেয়ে দুটোকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে আছে। বাচ্চা দুটোও কিছু না বুঝে বাবা-মা'র সঙ্গে কাঁদছে। কিন্তু কেন এই কান্না তা বুঝতে পারছে না। এভাবেই কেটে গেলো প্রায় আধা ঘণ্টা। আরও কিছুটা সময় এখানে কাটানোর ইচ্ছে থাকলেও ড্রাইভারদের চেঁচামেচিতে তা আর হলো না। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রশীদ সাহেবদের জন্য ভাড়াকৃত একটি বাসে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে সবাই উঠলেন। কিন্তু কারা তাদের জন্য এই বাসটি ভাড়া করেছে–তা তৎক্ষণাৎ জানা গেলো না। পরে জেনেছিলেন, ভারতের কন্স্যুলার অফিসের লোকজনই আগে থেকে ওই বাস ভাড়া করে রেখেছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এ পথেই প্রচুর বাঙালি এসেছে এবং আরও আসবে। তাই তারা এ ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অনেক। সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্ব জনমত তৈরিতে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর তৎপরতার কথা আমরা সবাই জানি।

এছাড়াও ভারতের সামরিক বাহিনী আমাদেরকে সরাসরি সহযোগিতা করেছে। যার ফলশ্রুতিতে মিত্রবাহিনীর জন্ম হয়। বাংলাদেশের অগণিত সামরিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা মিত্রবাহিনীর সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর সব আক্রমণ রুখে দিয়ে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। যার নাম বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থী সেই সময় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার এবং ভারতের সাধারণ জনগণও সেই সময় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শরণার্থীদের নানান ধরনের সেবা প্রদান করেছিলো। সুতরাং, ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণেরও অপরিসীম অবদান রয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। সেই ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি শরণার্থীদের উদ্ধারে আবারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলো—যার প্রমাণ রশীদ সাহেবের মতো আটকে পড়া আরও হাজার হাজার বাঙালি।

এবারে বেশ আশ্বস্ত হলেন রশীদ সাহেবসহ অন্যান্য বাঙালি শরণার্থীরা। এতোদিনের ক্লান্তি আর অবসাদ যেন নিমিষেই উধাও তাঁদের চেহারা থেকে। নানান ধরনের গল্প-গুজবে মাতিয়ে রাখলেন তাঁরা বাসের ভেতর। এতোক্ষণ ভয়ে আর শঙ্কায় থাকা মানুষগুলোর সেকি উল্লাস আর আনন্দ। যেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। সত্যিই তো, এই বা যুদ্ধের চেয়ে কম কিসে। নিশ্চিত মৃত্যুকে মাথায় নিয়েই স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী এসব বীর বাঙালিদের আনন্দে এতোক্ষণে সামিল হয়েছেন বাসের আফগান ড্রাইভারও। বোঝাই যাচ্ছে, তারাও পাকিস্তানিদের অত্যাচার আর ব্যবহারে অতীষ্ঠ। প্রতিবেশী এবং সর্বোপরি সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস বিধায় তারাও যে পাকিস্তানিদের দ্বারা অত্যাচারিত—তা তাঁর কথা এবং চেহারাতে স্পষ্ট। ওদিকে কান্দাহার থেকে বাসে ওঠার সময়েই বিদায় নিলো সেই আলোচিত ড্রাইভারদ্বয়। কাদের খান আর ওয়াহার খান। যাবার আগে রশীদ পরিবারের সাথে দেখা করে গেলেন তাঁরা। তাঁদেরও বেশ মন খারাপ। বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁরা বললেন, 'খোদা হাফেজ।' রশীদ সাহেবও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করলেন। করাচী থেকে কান্দাহার পর্যন্ত পথে তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য আবারও ধন্যবাদ জানান। মুচকি হেসে বিদায় নেয়ার সময় ড্রাইভাররা বলে গেলেন, 'আমরা স্মাগলার হলেও জবান এক। সে প্রমাণই তোমাদের দিয়ে গেলাম। খোদা তোমাদের সহায় হোন।' ফিরে গেলেন ওরা আবারও করাচীর পথে। তাঁদের যে আবারও অন্য কোনো শরণার্থীদের সীমান্তে পৌঁছে দিতে হবে। এটাই তো তাদের পেশা।

অতঃপর রশীদ সাহেবদের বহনকারী বাস ছুটে চললো আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উদ্দেশ্যে। রশীদ সাহেবের স্ত্রীর বুকে তখন ঘুমিয়ে আছে ছোট শিশু ফাইয়াজ। আর রশীদ সাহেবের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুচ্ছে বড় ছেলেমেয়ে দুটো। ভীষণ ক্লান্ত তারা। তাদের ওপর দিয়ে যে ধকল গেলো গত কয়েকদিন। তারপরেও আল্লাহর কাছে হাজার শোকর যে ভালোয় ভালোয় ওই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত হচ্ছেন তারা। এবারে দেশে পৌঁছুতে পারলেই হয়। বাস তখন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকেই এ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ হয়। এখন অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ বিধায় শীতের আমেজ বেশ পাওয়া যাচ্ছে। রশীদ সাহেব বাসের জানালার কাঁচ টেনে দিলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন বাসের অন্য যাত্রীরাও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বিধায় পেছনের সিটের সাথে মাথা এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন। সবাই যেন শান্তিতে একটু ঘুমাতে পারে সেজন্য ড্রাইভার বাসের ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন রশীদ সাহেব। ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার বিধায় কিছুই নজরে এলো না তার। তবে বেশ বুঝতে পারলেন যে, পাহাড়ী দুর্গম পথেই চলেছেন তারা। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গাঁয়ে দু'একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো আফগান উপজাতীদের ঘর-বাড়ি। এ এলাকাতে প্রধানত উপজাতীদের বাস। তবে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে রাস্তায় কারোরই দেখা পেলেন না রশীদ সাহেব। ওদিকে বাচ্চাগুলো তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

এভাবে বাস চলতে চলতে রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেলো। এর মাঝে কিছু সময়ের জন্য তাঁর স্ত্রীও একটু ঘুমিয়ে নিলেও রশীদ সাহেব ছিলেন

একেবারে নির্ঘুম। এক মিনিটের জন্যও তিনি ঘুমোলেন না। পাছে বাচ্চাদের কোনো অসুবিধা হয়—এ চিন্তাই তাঁর মাথায় সর্বক্ষণ। আরও একটি ভয় তাঁর ছিলো সে সময়। আর তা হচ্ছে পথে ডাকাতির ভয়। সেহেতু এটি উপজাতি এলাকা, সেহেতু এ জাতীয় ঘটনার কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় দৈনিক পত্রিকায় সেই সময় প্রায়ই খবর বেরুতো সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আফগান উপজাতি দলগুলোর ডাকাতি আর নিরীহ মানুষ অপহরণের কথা। রশীদ সাহেবের যেহেতু ভূগোলে জ্ঞান বরাবর বেশ ভালোই ছিলো, তাই কান্দাহারের এ প্রান্তে আসতেই তাঁর মনে পড়ে গেলো সেসব কথা। যদিও ইচ্ছে করেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে এসব কথা বললেন না পাছে তিনিও ভয় পেয়ে যান। এই নির্জন রাতে যে কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকাতি আর অপহরণ করে নিয়ে গেলে এ জনমে আর খুঁজে পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এমনকি ৮-১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জনমানব এমনকি কোনো পুলিশ চৌকিরও সন্ধান পাওয়া দুস্কর। সুতরাং, এ রাস্তায় আল্লাহই একমাত্র ভরসা। একা থাকলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে রাতটা পার করে দিতেন তিনি। কিন্তু পরিবার নিয়ে তো আর তা সম্ভব নয়।

যাই হোক, ঠিক সকাল আটটায় বাস এসে থামলো গজনী নগরীতে। পাহাড়ী এ ছোট শহরের চারদিকে উচুঁ পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে আসছে স্বচ্ছ ঝর্নার জল। এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বাস থেকে নীচে নেমে এলেন প্রায় সবাই। দু'একজন অবশ্য রয়ে গেলেন বাসের মধ্যেই। রশীদ সাহেব কাছেরই একটা ঝর্নার জলে চোখ-মুখ ধুয়ে নিলেন। এতোক্ষণে বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও একই কায়দায় হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়েও কোনো খাবারের দোকান বা রেস্তোরাঁ নজরে এলো না কারও। দু'য়েকটা যাও দোকান দেখা গেলো তাও কপাট বন্ধ। শীতের এই সকালে জনমানবহীন এক মফস্বল শহরে কেই বা বাড়ির বাইরে যায়। অগত্যা বিফল মনোরথে আবার বাসে উঠে পড়লেন অনাহারী সব যাত্রী সকল। তাঁদের সাথে আছেন রশীদ সাহেবও। রশীদ সাহেবের শুকনো মুখ দেখেই বুঝে গেলেন তাঁর স্ত্রী। কি আর করা। তাঁর এখন একমাত্র চিন্তা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে। ঘুম থেকে জেগে উঠে নিশ্চয়ই খাবার চাইবে

ওরা। এরকম জানলে আগের দিন রাতে আফগান ওই উপজাতির ঘর থেকে বাড়তি আরও দু-তিনটা রুটি কিনে নিলেই হতো। কে জানে যে, এখানে কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না।

এসব ভাবতে ভাবতেই সকাল গড়িয়ে দুপুর আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো। ইতিমধ্যে ছেলেমেয়ে দুটো জেগে উঠেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য একবারের জন্যও খাবারের জন্য কোনো আবদার করলো না তারা। বাচ্চা দুটো এখন বেশ বুঝে গিয়েছে যে, পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে তাদের বাবা-মায়ের পক্ষে কোনো খাবার দেয়া সম্ভব নয় এ মুহূর্তে। সুতরাং আবদার আর আকুতির যে কোনো মূল্য নেই এ মুহূর্তে তাঁদের বাবা-মায়ের কাছে তা বেশ বুঝে গেছে তাঁরা। আর তাইতো তাঁদের এই নীরবতা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু বাস চলছে তো চলছেই। সন্ধ্যার একটু পর পরই বাস গিয়ে থামলো সেই বহুল প্রতিক্ষিত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে।

সেখানে বাস স্ট্যান্ডে রশীদ সাহেবদের সহাস্য অভ্যর্থনা জানালো ভারতের কনস্যুলার অফিসের লোকজন। মনে হয়, রশীদ সাহেবদের জন্য অপেক্ষায় ছিলো তাঁরা। বাসের ভেতরে ঢুকলেন প্রায় ৪-৫ জন। সেখানে রীতিমতো ছোট-খাট একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন তাঁদের মধ্য থেকে বয়স্ক এবং বস গোছের একজন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার তাদের সাধ্যমত সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানসহ নানাভাবে সহযোগিতা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা এখানে এসেছেন ভারত সরকারের হয়ে বাঙালিদের সাহায্য করতে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তখন পর্যন্ত কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিলো না। যেহেতু পাকিস্তানের প্রতিবেশি দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান, তাই তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে, এ পথেই বাঙালিরা পালিয়ে আশ্রয় নেবেন। সেই হিসেবে কান্দাহারের ওই সীমান্তে তারা আগে থেকেই বাস ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁদেরও ইচ্ছে ছিলো বাঙালি শরণার্থীদের কান্দাহারের সীমান্তেই অভ্যর্থনা জানানো। কিন্তু সঠিক সময় না জানার কারণেই পরবর্তীতে তাঁরা কাবুলে এসে শরণার্থীদের অভ্যর্থনার সিদ্ধান্ত নেন। সে হিসেবেই তাঁরা এখানে এসেছেন। এখন তাঁরা রশীদ সাহেবদের

নিয়ে তাঁদের জন্য নির্ধারিত হোটেলে উঠবেন। ওখানে প্রায় ৭-৮ দিনও থাকতে হতে পারে। কারণ, রশীদ সাহেবসহ অন্যান্য কারোরই কোনো পাসপোর্ট নেই। একই দেশ ছিলো বিধায় তখন পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্ত এখন যেহেতু আফগানিস্তান আর ভারত হচ্ছে স্বাধীন দেশ, তাই নতুন দেশে ঢুকতে হলে ভিসা নিয়েই ঢোকার নিয়ম। যেহেতু এখন সময় খুবই কম। তাই কর্তৃপক্ষ রশীদ সাহেবদের বিশেষ ট্রানজিট পাস ইস্যু করবে। আর তার জন্য ছবি তোলা, ফর্ম পূরণ করা, দেশ থেকে ক্লিয়ারেন্স আসা ইত্যাদি কাজের জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন। অতএব কাবুলের শৈত্যপ্রবাহের সাথে সখ্য আর খেয়েদেয়ে গল্প-গুজব এই চলছিলো তখন। রশীদ সাহেবের বেশ ইচ্ছে হচ্ছিলো কাবুল শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখার। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডার কথা চিন্তা করে সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সবার জন্য হোটেলের পাশেই খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অতএব তিন বেলা খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমানো এই হলো কাবুলের দিনলিপি। যে হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা মূলত গেস্ট হাউজ কিংবা সার্ভিস এপার্টের্মেন্টের মতো। অনেকগুলো ৪-৫ তলা বিল্ডিং রয়েছে সেই কমপ্লেক্সে। রশীদ সাহেবের বড় ছেলে অহন কাবুলে এসেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ঠাণ্ডা, জ্বর আর সর্দিতে আক্রান্ত সে। অতএব ডাক্তারের সন্ধানে নেমে পড়লেন তিনি। পেয়েও গেলেন একজনকে। তিনি একজন বিদেশি, সাদা চামড়ার লোক, বাড়ি পোল্যাণ্ডে। কাবুল এসেছিলেন বেড়াতে পেশায় ডাক্তার এই ভদ্রলোক। কিন্তু বাঙালি শরণার্থীদের দুদর্শা দেখে বেড়ানো বাদ দিয়ে বিনামূল্যে পেশাগত দায়িত্ব পালনে লেগে গেছেন তিনি। ডাক্তারী যে কতো বড় মহান পেশা রশীদ সাহেব তা বেশ বুঝতে পারলেন। অহনকে নিয়ে তিনি তাঁর কাছে গেলেন। তিনি ভালো মতো পরীক্ষা করে কিছু ঔষধ সাথে সাথেই বিনামূল্যে দিয়ে দিলেন রশীদ সাহেবকে। কিন্তু অহন তো কিছুতেই ট্যাবলেট খেতে চায় না। অগত্যা মিষ্টি কিনে খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে তবেই ঔষধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হলো।

ওদিকে কাবুলে শীত আরও জেঁকে বসেছে। বিষয়টা অনেকটা এরকম যে, এক গ্লাস পানি বাইরে ঢেলে দিলে একটু পর তাও বরফ হয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে পরপর দু'দিন কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে পুরো পরিবার নিয়ে যেতে হলো। পাসপোর্ট আকারের ছবি তোলা, ফর্ম পূরণ, নাম-ঠিকানা লেখার পাশাপাশি ছোটখাট সাক্ষাৎকারও নেয়া হলো তাঁদের। কোথায় চাকরি করতেন, কতোদিন ছিলেন, ছেলেমেয়েদের বয়স কতো ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আবার শুধুই অপেক্ষা। এভাবেই কেটে গেলো প্রায় সাত দিন। অষ্টম দিন খবর পেলেন তাঁদের যাবার ব্যাপারে। যথারীতি স্পেশাল ট্রানজিট পাস দেয়া হলো তাঁদের। সাথে প্লেনের টিকিটও। মনে আছে এরিয়েনা আফগান এয়ারলাইন্সের স্পেশাল ফ্লাইটযোগে কাবুল থেকে তাঁরা রওনা দিলেন ভারতের রাজধানী দিল্লির উদ্দেশ্যে। রশীদ সাহেবের পরিবারসহ অন্য সবারই ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিলো কোনো এক প্যাকেজ ট্যুরে বেড়ানোর জন্য যাচ্ছেন একদল পর্যটক। এক্ষেত্রে কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা ছিলো সত্যিই উল্লেখ করার মতো। টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া বিমান ভাড়া সবই বহন করেছে তাঁরা।

যথারীতি দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও রশীদ সাহেবরা পেলেন ভিআইপির সম্মান। ফুলের মালা দিয়ে তাঁদের বরণ করে নিলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এয়ারপোর্ট থেকে বাসযোগে তাঁদের পাঠিয়ে দেয়া হলো হোটেলে। কিন্তু হোটেলে পৌঁছে দেখলেন তাঁদের আগে আসা বাঙালি শরণার্থীতে ঠাসা হোটেলটি। কিন্তু যেহেতু শরণার্থীরা চলেই এসেছে, তো তাদের জায়গা না দিয়ে কি পারেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। আর তাই হোটেলের গ্যারেজে ঠাঁই হলো রশীদ পরিবারের। মাটিতে বিছানা বিছিয়ে অন্যান্য বাঙালিদের সাথে ঠাঁই হলো। কিন্তু কেউই এক চুলও প্রতিবাদ করলো না এতে। বরং সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি পরিবার হয়ে গেলেন। একজনের খবর আরেকজন নিচ্ছেন। গল্প-গুজবে আর হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠছেন সবাই। যেন সবাই কতো দিনের পূর্ব পরিচিত। এই হয়। দেশে দিনের পর দিন একসঙ্গে থাকলেও খুব বেশি সখ্য আর বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু যেই কেউ বিদেশে যায় অমনি দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্ম নেয়। বিদেশে বাঙালি দেখলেই কথা বলতে ইচ্ছে করে। সাহায্য সহযোগিতা করতে

সবাই এগিয়ে আসে। এমনকি নতুন কাউকে দেখলে নিজ বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে লোকজন। এই জন্যই অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে বাঙালিদের খ্যাতি জগৎজোড়া।

রশীদ সাহেবের পরিবারেরও তাই হলো। দু-একটা পরিবারের সাথে তো এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেলো যে দেখে সবাই ভাবতে থাকলো ওরা বোধহয় বহুদিনের পুরনো বন্ধু-বান্ধব। এদিকে দিল্লিতে এসে বড় মেয়ে, তার স্ত্রী এবং ছোট শিশুটিও বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লো। প্রথম দু-তিন দিন গেলো তাঁদের সুস্থ করে তুলতে। এখানেও কাবুলের মতোই অবস্থা। খাওয়া-দাওয়ার কোনো অভাব নেই। পরিবারের সবাই একটু সুস্থ হলে রশীদ সাহেব পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দিল্লির দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য। কুতুব মিনার, রেডফোর্ট, গান্ধীর মাজার কোনো কিছুই বাদ পড়লো না এ তালিকা থেকে। ছোট ছেলে মেয়ে দুটো মহা খুশি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে। অহন তো রীতিমত দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে বলে মনে হলো। ওদিকে উপলাও কম কিসে। চললো দু-ভাইবোনের দৌড় প্রতিযোগিতা। রশীদ সাহেব আর তার স্ত্রী ওদের বাধা দিলেন না। কতোদিন ধরে ওরা বদ্ধ জীবনযাপন করছে। রশীদ সাহেবও ছোট শিশুটিকে নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঘুরতে লাগলেন। তখন দিল্লিতে ছিলো দিপাবলী উৎসব। হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহৎ এই অনুষ্ঠানে আতশবাজি আর আলোর ঝলকানিতে মুখর হয়ে উঠেছিলো দিল্লির রাস্তা-ঘাট। যে হোটেলে ছিলেন রশীদ সাহেবরা তার অন্যান্য হিন্দু বাসিন্দারাও মহাধুমধামে আয়োজন করেছিলেন দিপাবলী উৎসবের। রশীদ সাহেব তার পরিবার নিয়ে সেসব অনুষ্ঠানের বেশ ক'টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

আর এভাবেই দিল্লিতে কেটে গেলো প্রায় ৫-৬ দিন। দিল্লির ভারতীয় দূতাবাসে ডাকা হলো তাদের। প্রত্যেক পরিবারকে ৫০০ রুপি করে দেয়া হলো পথ খরচের জন্য। টাকা পেয়ে আনন্দ আর ধরে না শরণার্থী পরিবারগুলোর। অনেকেই কিছু কেনাকাটাও সেরে নিলেন এই ফাঁকে। করাচী থেকে রওনা হবার সময় শুধুমাত্র এক কাপড়েই বেরিয়ে এসেছেন

তারা। রশীদ সাহেব ছেলেমেয়ে দুটো এবং ঢাকায় তাঁর এক ভাগ্নের জন্য কিছু কাপড় চোপড় কিনে ফেললেন। এবার আবারও যাত্রা কলকাতার উদ্দেশ্যে। মনে আছে, দিল্লি থেকে ট্রেনে যেদিন রওনা দিয়েছিলেন কলকাতার উদ্দেশে, স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ। দু-একজন তো কেঁদেই ফেললেন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলেন রশীদ সাহেবরা। জনতা এক্সপ্রেস যোগে তারা রওনা হলেন কলকাতার হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। পথে পথে বিভিন্ন রাজ্য পেরিয়ে আর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা যাত্রার পর ট্রেন এসে থামলো কলকাতার হাওড়া স্টেশনে। এখানেও তাদের দেয়া হলো ফুলেল শুভেচ্ছা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রশীদ সাহেবসহ অন্যান্য বাঙালিরা আর ভারতে থাকতে চাইলেন না। বাংলাদেশের এতো কাছে এসে তাঁদের আর তর সইছিলো না। তাই আবার হাওড়া স্টেশন থেকে সবাই চলে এলেন শিয়ালদা রেলস্টেশনে। কারণ, তাদের পরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে বনগাঁ রেলস্টেশন। শিয়ালদা স্টেশনে এসেই তৎক্ষণাৎ ট্রেন পেয়ে গেলেন তারা। এবার গন্তব্য বনগাঁ। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই হাসি-তামাশার পর্ব শেষে তারা পৌঁছে গেলেন বনগাঁ। বনগাঁ থেকে নেমে এবার রিক্সা করে যেতে হবে হরিদাসপুর বা এখনকার পেট্রাপোল। সে সময় এখনকার মতো সরাসরি কিংবা কাটা বাস সার্ভিসও ছিলো না। ফলে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে রিক্সাযোগে বনগাঁ এবং পরবর্তী সময়ে বনগাঁ থেকে ট্রেন ছাড়া কলকাতায় যাবার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না।

যথারীতি রশীদ সাহেবরা পৌঁছে গেলেন বনগাঁ। ভারতীয় কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তারাও তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো। কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা পৌঁছে গেলেন নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে। ওই তো ওপারেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ ওপারে পৌঁছেই রশীদ সাহেবসহ অন্যান্য যাত্রীরা মাটিতে শুয়ে চুমু খেলেন। মাটি তুলে নিয়ে সারা গায়ে মাখিয়ে দিলেন। সেই সাথে শুরু হলো কান্না। সমস্বরে সবাই মিলে কাঁদছে। ছোট ছোট বাচ্চারাও এ থেকে বাদ যাচ্ছেন না। তাদের এ অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন

বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন আর সীমান্ত রক্ষীরা। মাথায় আর গায়ে হাত বুলানোর পাশাপাশি জড়িয়ে ধরলেন একে অন্যকে। যাই হোক, অত্যন্ত তড়িৎগতিতেই সম্পন্ন হলো তাঁদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। কিন্তু কিছুটা হতাশ হলেন রশীদ সাহেবসহ অন্যরা–বাংলাদেশের কেউ তাদেরকে অভ্যর্থনা না জানানো দেখে। কাবুল, দিল্লি আর কলকাতায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের যেভাবে পেয়েছিলেন তারা, এখানে কারোরই টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে রশীদ সাহেবসহ অন্য একটি পরিবার ঠিক করলেন যে, তারা প্রথমে যশোরে যাবেন। সেই সময় কোনো বাস সরাসরি বেনাপোল-ঢাকা অব্দি চলাচল করতো না বিধায় রশীদ সাহেবরা বেনাপোল থেকে যশোর পর্যন্ত একটি প্রাইভেট কার ঠিক করলেন। দিল্লি থেকে পাওয়া ৫০০ রুপির সম পরিমাণ টাকা তাদের কাছে রয়েছে। সুতরাং টাকা-পয়সা কোনো ব্যাপারই না তাদের কাছে। মনে আছে, রাস্তা খারাপ বিধায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে তারা পৌঁছুলেন যশোরে। এবার হোটেল খোঁজার পালা। খুঁজতে খুঁজতেই শহরেই সাধারণ মানের একটা হোটেল পাওয়া গেলো, হোটেল না বলে ছোটখাট গেস্ট হাউজই বলা ভালো।

আর সেদিনই ছিলো পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র। মনে আছে, ১৩ তম রোজার দিন করাচী থেকে রওনা দিয়েছিলেন রশীদ সাহেবরা। প্রায় ১৭ দিনে জীবনকে বাজি রেখে অসীম সাহসিকতাপূর্ণ এই অভিযানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন রশীদ সাহেবরা। কিন্তু আজ যেহেতু ঈদের দিন তাই একটু ভালো খাবার-দাবারের প্রয়োজন। আজ ঈদের দিন বিধায় গেস্ট-হাউজের একজন দারোয়ান ছাড়া আর কোনো কর্মচারীই নেই। রুম খুলে দিলেও খাবারের কোনো ব্যবস্থাই নেই ওখানে। রশীদ সাহেব বাইরে বের হলেন কোনো রেস্তোরাঁয় খাবার পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন সমস্ত শহর নীরব। দোকান-পাট সবই বন্ধ। এই মফস্বল শহরে দোকান-পাটের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। অগত্যা হতাশ হয়ে গেস্ট-হাউজে ফিরলেন রশীদ সাহেব। গেস্ট হাউজের দারোয়ানের বোধ হয় খুব মায়া হলো এসব দেখে। সে কোত্থেকে যেন কিছু চাল ও কিছু মুসরের ডাল আর আলু জোগাড় করে আনলো। ব্যস, রশীদ সাহেবের স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলারা লেগে গেলেন খাবার তৈরিতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে-খাবার তৈরি শেষে সবাই একসাথে খেতে বসলেন। ঈদের খাবার, ভাত,

ডাল আর আলু ভর্তা। আহ্, সেকি স্বাদ। পরম তৃপ্তিতে খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলতে থাকলেন মানুষগুলো–যাদের ওপর দিয়ে গত ১৭ দিনে কি অমানুষিক যন্ত্রণাই না বয়ে গেছে।

যাহোক, খাবারের ব্যবস্থা না হয় হলো, কিন্তু ঢাকায় ফিরবেন কি করে। রশীদ সাহেব তার সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোককে নিয়ে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গেলেন দেখা করতে। অনুরোধ করলেন তাদের ঢাকা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাঁদেরকে হতাশ করে দিয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় তাঁর অপারগতার কথা প্রকাশ করলেন। জানিয়ে দিলেন, যা করার তাদের নিজেদেরই করতে হবে। হায় সেলুকাস! নিজ দেশেই এখন নিজেদের পরবাসী মনে হচ্ছে তাদের। কি আর করা, এবার রশীদ সাহেবরা নিজেরাই বেরিয়ে পড়লেন ঢাকা যাবার যানবাহন ঠিক করার জন্য। বাস কিংবা প্রাইভেট যান কিছু না পেয়ে যখন তারা বেশ হতাশ ঠিক তক্ষুণি খবর এলো যে, একটা ট্রাক পাওয়া গিয়েছে। সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ ট্রাকটা ভাড়া করে ফেললেন। ইতিমধ্যে তাদের সাথে দেখা হয়ে গেলো পাকিস্তান ফেরত আরও অনেক বাঙালির। সবাই মিলে পরদিন ট্রাকে চেপে বসলেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। মনে আছে, সকালে নাস্তা কিনে ট্রাকে বসেই চলন্ত অবস্থায় সবাই খেয়ে নিয়েছিলেন।

আবারও হাসি তামাশা গল্প গুজব। এবারে পাকিস্তানের মতো কোনো ভয় নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থাৎ নিজের দেশে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। কোনো ভয় আর আতংকে কাটবে না তাঁদের দিনগুলো, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। এভাবেই আস্তে আস্তে ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর আর মানিকগঞ্জ-আরিচা হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন রশীদ সাহেবরা। মাঝখানে ফেরিও পেরিয়ে এসেছেন তারা। ঢাকায় ফকিরেরপুল পর্যন্ত ট্রাক ভাড়া করা হয়েছিলো। আস্তে আস্তে রাস্তায় যে যার মতো নেমে যাচ্ছে আর বিদায়বেলায় হাত নেড়ে শুভ কামনা জানাচ্ছে। ফকিরেরপুল পর্যন্ত একমাত্র রশীদ পরিবারই রইলেন। আগেই রশীদ সাহেব ঠিক করে রেখেছিলেন যে, ঢাকায় থাকা একমাত্র ফুফাতো বোনের বাসাতেই তিনি প্রথমে উঠবেন। পরে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। তার ভগ্নিপতি তখন টিএন্ডটি'তে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে ফকিরেরপুলে অবস্থিত টিএন্ডটি

কলোনিতে তাদের কোয়ার্টার ছিলো। আন্দাজের ওপর জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন রশীদ সাহেব তাঁর বোনের বাসা—যাকে তিনি রেজু বুবাই বলে ডাকতেন। দরজা খুলে রশীদ সাহেবের পরিবারকে দেখে আনন্দাশ্রু তাঁদের চোখে-মুখে। তাঁরা জানতেন যে, রশীদ সাহেবরা আটকা পরেছেন পাকিস্তানে। কিন্তু কিভাবে কখন ওখান থেকে রওনা দিয়ে দেশে পৌঁছেছেন—তা তাঁদের অজানাই ছিলো। ভাই-বোনের আনন্দ-মিলনের পর রশীদ সাহেব এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন তার বড় ভাগ্নেকে—যার জন্য একটা সার্ট কিনে এনেছেন তিনি দিল্লি থেকে। মনে আছে, শেষবার যখন দেশে বেড়াতে এসেছিলেন তখন এই ভাগ্নের সাথে গ্রামের বাড়িতে তার দেখা হয়েছিলো। তখনই সে মামার কাছে আবদার করেছিলো যে, আবার দেশে আসলে তার জন্য যেন অবশ্যই একটি সার্ট কিনে আনা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ভাগ্নের কথা ঠিকই মনে ছিলো রশীদ সাহেবের। কিন্তু কোথাও তাঁকে না পেয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করলেন তার কথা। ছোট্ট ব্যাগ থেকে সার্টটাও বের করলেন তাকে দেবার জন্য।

আর তক্ষুণি আর্তনাদ করে সজোরে চিৎকার করে উঠলেন তার বোন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোর ভাগ্নে আর বেঁচে নেই রে রশীদ। পাকিস্তানি রাজাকাররা ওকে ধরে নিযে গিয়েছে। আর ফেরে নাই।" বলেই অঝোর ধারায় কান্না জুড়ে দিলেন তিনি। বোনকে সান্ত্বনা দেবার আর কোনো ভাষা জানা রইলো না রশীদ সাহেবের। পরে শুনেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন হবার মাত্র কয়েকদিন আগে ১২ কি ১৩ ডিসেম্বর টিএন্ডটি কলোনি থেকে দুপুরের খাবার খাওয়া অবস্থায় তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর কিছু রাজাকার-আলবদররা। তারপরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরে শুনেছিলেন যে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আরও অনেকের সঙ্গে তাঁকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি তাঁর। এমন কি আজ পর্যন্ত তার কোনো লাশেরও সন্ধান পান নি তারা। রশীদ সাহেব লক্ষ করলেন তার ভগ্নিপতির চোখের কোনেও এক ফোঁটা অশ্রু। পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন বোঝা হচ্ছে, বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ। সেই কঠিন বোঝা আজও তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন।

এবার কেঁদে উঠলেন স্বয়ং রশীদ সাহেব। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৭

দিনে দুর্বিসহ সময় পেরিয়ে দেশে পৌঁছুতে তার যা কষ্ট হয়েছে—তার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি কষ্ট তাঁর বোন আর ভগ্নিপতির অন্তরে। এমনি কতো রেজু বুবাই বাংলার আনাচে-কানাচে গুমরে গুমরে কাঁদছে—তা মনে করে শিহরিত হলেন তিনি। ভাগ্নেকে নতুন সার্ট আর দেয়া হলো না রশীদ সাহেবের। পরদিন নতুন কর্মস্থল বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে রিপোর্ট করলেন রশীদ সাহেব। ব্যাংক থেকে তৎক্ষণাৎ একমাসের অগ্রীম বেতন দিয়ে ১৫ দিনের ছুটি দিয়ে দেয়া হলো। রশীদ সাহেবও পরদিন রওনা দিলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানার মিরারচরে।

আর এভাবেই শেষ হলো মাত্র ১৭ দিনের রোমাঞ্চকর, দুঃসাহসী আর কষ্টকর এক অভিযাত্রা—যার শুরু হয়েছিলো করাচী থেকে আর শেষ হলো ঢাকায়।

পাদটীকা

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশে একটি অতি গৌরবজ্জ্বল ঘটনা। মাত্র ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো একটি আধুনিক ও প্রশিক্ষিত শক্তিকে পরাজিত করে বাঙালি প্রমাণ করেছিলো যে, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর কঠিন দেশপ্রেমের কাছে কোনো শক্তিই টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে। তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণীর এবং পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি দেশ ভারত এবং তাদের সাধারণ জনগণেরও ভূমিকা অপরিসীম। যে এক কোটি বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতের সাধারণ জনগণেরও সেখানে একটা বড় স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো। বিশেষত ত্রিপুরা রাজ্য এক্ষেত্রে অন্যতম।

কিন্তু এর পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়, দেশ বিদেশের প্রবাসী বাঙালি এবং সচেতন জনগণও জনমত গড়ে তোলে। এরই ফলশ্রুতিতে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে পণ্ডিত রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন, পণ্ডিত আল্লারাখারা আয়োজন করেছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও গবেষণা, ইতিহাস আর চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নাট্য নির্দেশক ও চলচ্চিত্রকার নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু তাঁর প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র *'গেরিলা'*। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রটি যথেষ্ট আলোচিতও হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও শুধুমাত্র পেশাগত কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিরা, যারা যুদ্ধকালীন সময়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশে ফিরতে পারেন নি, তাঁরা আমাদের কাছে বিস্মৃতই থেকে গেছেন। এমনওতো উদাহরণ আছে যে, মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক বাঙালিই পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে তাদের আনুগত্য-প্রদর্শন করে সেখানেই স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন। কিন্তু এর বিপরীতে রশীদ সাহেবদের মতো আরও

অসংখ্য অন্তঃপ্রাণ বাঙালি ছিলেন সেখানে, যারা ঘৃণাভারে পশ্চিমাদের দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ ফিরে আসেন। ওই ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ অভিযাত্রায় অনেকের মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের চেয়ে কম কিসে।

রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এরকম একেকজন রশীদ সাহেবদের খুঁজে বের করে তাদের যথাযথ সম্মান দেয়া। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে এসে রশীদ সাহেবরা মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট চান না রাষ্ট্রের কাছে বরং দেশমাতৃকার টানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১২০০ মাইল পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে এসে ইতিহাসের অংশ হতে চান। চান রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ সম্মান। তাঁদের এই সম্মান দিলে রাষ্ট্র নিজেও সম্মানিত হবে। রশীদ সাহেবরা এখনও স্বপ্ন দেখেন যে, একদিন নিশ্চয়ই সেদিন আসবে। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু।।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যখন শেষ হয়েছে তখন থেকে শুরু হয়েছে আটকে-পড়া বাঙালিদের মুক্তির আরেক সংগ্রাম। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের এই পর্ব নিয়ে খুব বেশি লেখা চোখে পড়ে না। পাকিস্তানে অবরুদ্ধ দিন, আটকখানায় বন্দিজীবন এবং সব রকম সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশের অভিজ্ঞতা বিষয়ে গুটিকয় বই প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রায় অনালোচিত সেই অধ্যায় নিয়ে তৌফিক রহমান প্রণীত 'ডেটলাইন ১৯৭১ : করাচি থেকে ঢাকা' গ্রন্থ প্রকাশকে তাই নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাতে হয়। দেশপ্রেমের প্রশ্নে নিরাপোষ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনে নেমে-আসা বিপর্যয় এবং বিপদ-বাধা অতিক্রম করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষ্য গল্পকথার আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে